দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর এবং গোয়েন্দা গিন্নির অলীক কুনাট্য
— পৃঃ ২৪

কলেজের বাইরে থেকে গিয়ে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা সম্ভব নয়
— পৃঃ ২৮

৭১ বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা।। ২৭ মে ২০১৯।। ১২ জ্যৈষ্ঠ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com



বাঙ্গলায় গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭১ বর্ষ ৩৭ সংখ্যা, ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

২৭ মে - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাকি ভারতের মেলবন্ধন করলেন নরেন্দ্র মোদী ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ৬

খোলা চিঠি : এ লজ্জা কোথায় রাখবো? ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

উত্তরাধিকারের ঢাক পেটালে তার ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে ▯ বৈভব পুরন্দরে ▯ ৮

ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর মনোনয়ন ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১১

হিন্দুত্বই ভারতের অন্তরাত্মা ▯ ড. মনমোহন বৈদ্য ▯ ১৩

হিন্দুত্বের বিশ্বব্যাপকতা ▯ মানস কুমার সান্যাল ▯ ১৪

'হায় বাঙ্গালি একুশ নিয়ে গর্ব করো, শিলচরেতে কি হয়েছিল বলতে পারো' ▯ ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১৫

কমিউনিস্টরা শুধু ধর্মবিরোধী নয়, প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষী ▯ ডা: আর দাস ▯ ১৭

গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধে এগিয়ে বাঙ্গলা ▯ ২৩

প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর এবং গোয়েন্দাগিন্নির অলীক কুনাট্য ▯ সনাতন রায় ▯ ২৪

বিদ্যাসাগরের মূর্তিভাঙা— হিন্দু-মুসলমান, বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি ইত্যাদি তত্ত্ব ▯ অভিমন্যু গুহ ▯ ২৬

কলেজের বাইরে থেকে গিয়ে মূর্তি ভাঙা সম্ভব নয় ▯ সুকল্যাণ রায় ▯ ২৮

ফিরে আসছে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাঙ্গালি হিন্দু জাতীয়তাবোধ ▯ জ্যোতিপ্রকাশ চ্যাটার্জি ▯ ৩০

বিশ্বের আদি সাংবাদিক নারদ ▯ ওমপ্রকাশ সিংহ ▯ ৩১

সংস্কৃত সাহিত্যের এক বিশেষ ধারা— চম্পূ কাব্য ▯ অমিত ঘোষ দস্তিদার ▯ ৩৩

গল্প : হারিয়ে পাওয়া ▯ কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৫

পশ্চিমবঙ্গে গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন মমতা ▯ রবীন্দ্রনাথ দত্ত ▯ ৪২

কমল হাসানের টনিকে পাবলিকের বদহজম ▯ সন্দীপ চক্রবর্তী ▯ ৪৩

ভোটের তরজায় অপসংস্কৃতির আমদানি ▯ অনিলচন্দ্র দেবশর্মা ▯ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** ▯ **চিত্রকথা : ৪০** ▯ **খেলা : ৪১**▯ **কৃষিজগৎ : ৪৫** ▯ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮** ▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে
৩ জুন
২০১৯

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
৩ জুন
২০১৯

লোকসভা নির্বাচনের ফল, ২০১৯

ভোটগ্রহণ শেষ হওয়া মাত্র প্রায় প্রতিটি বুথ ফেরত সমীক্ষায় সম্ভাব্য বিজয়ী হিসেবে এন ডি এ-র নাম উঠে এসেছে। নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী যে দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে যাচ্ছেন সে ব্যাপারে তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ রাখেননি ভোট বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল এবং প্রকৃত ফলের মধ্যে অনেকসময় পার্থক্য থেকে যায়। নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হবে ২৩-২৪ মে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক কয়েকটি লেখা।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name :
United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার



SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

সর্বনাশের দোরগোড়ায় পশ্চিমবঙ্গ

লজ্জায় মুখ ঢাকিয়াছে বঙ্গভূমি। স্বাধীনতার পর হিংসার এমত তাণ্ডব বঙ্গবাসী পূর্বে হয়তো প্রত্যক্ষ করে নাই। চৌতিরিশ বৎসরের কুখ্যাত বামপন্থী শাসনকেও ইহা ম্লান করিয়াছে। সমস্ত বিরোধীদলের কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতির পথযাত্রায় আক্রমণ করা হইয়াছে। তাঁহার অভিযোগ তাঁহাকে প্রাণে মারিবার চক্রান্ত করা হইয়াছিল। তাঁহার পথযাত্রায় মানুষের স্বতস্ফূর্ত যোগদানে ঈর্ষান্বিত হইয়া ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতিকে কালিমালিপ্ত করিবার প্রয়াসে বিদ্যাসাগর কলেজের বিদ্যাসাগরের মর্মর মূর্তি রাজ্যের শাসক দলের বাহুবলীরা ভগ্ন করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। নিজেদের পাপ ঢাকিবার জন্য পুলিশকে দিয়া তাহারা ভারতীয় জনতা পার্টির অর্ধশত কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, সপ্তম দফা নির্বাচনের পূর্বে বিরোধী দলের বহু কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে পুরিয়াছে। রাজ্যের শাসক দল সর্বত্র একটা ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে। হিংসার এমন ভয়ংকর রূপ দেখিয়া দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের পরই নির্বাচন কমিশনের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত পুলিশ পর্যবেক্ষক বিবেক দুবে মন্তব্য করিয়াছিলেন, হিংসায় পশ্চিমবঙ্গ পূর্বেকার বিহার রাজ্যকেও হার মানাইয়াছে।

এত হিংসা, এত রক্ত, গণতন্ত্রকে এমনভাবে পদদলিত করা বঙ্গবাসীর পক্ষে লজ্জাস্বরূপ। অথচ উনবিংশ শতাব্দীতে এই বঙ্গভূমিতেই নবজাগরণের উন্মেষ ঘটিয়াছিল। এবং তাহা সমগ্র ভারতভূমিকে প্লাবিত করিয়াছিল। সেই নবজাগরণের পুরোধাপুরুষদের অন্যতম ছিলেন বিদ্যাসাগর। ক্ষমতায় টিকিয়া থাকিবার জন্য এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কালিমালিপ্ত করিবার জন্য সেই বিদ্যাসাগরের মূর্তিকে ভগ্ন করিতেও রাজ্যের শাসকদল ইতস্তত করিতেছে না। হিংসার এমন করাল রূপ দেখিয়াই নির্বাচন কমিশন সপ্তম দফা নির্বাচনের ৭২ ঘণ্টা পূর্বেই ৩২৪ ধারা প্রয়োগ করিয়া নির্বাচনী প্রচারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছিল। তাহাতেও শেষ রক্ষা হয় নাই। শাসকদলের বাহুবলীরা বিরোধী পক্ষের ভোটারদের পাড়া ছাড়া করিয়াছে। ভোটের দিন দিকে দিকে রক্তপাত ঘটাইয়া ভোটলুঠ অব্যাহত রাখিয়াছে। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন হিংসা দিয়া শুরু হইয়াছিল, হিংসা দিয়াই সমাপ্ত হইল। কিন্তু হিংসার সমাপ্তি ঘটিল না।

ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের পদযাত্রায় আক্রমণ এবং বিদ্যাসাগর মূর্তি ভাঙার নাটককেপশ্চিমবঙ্গের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একটি বড়ো ও জেহাদি হিংসাকে আড়াল করিবার প্রয়াস মনে করিতেছেন। তাহা কোনও পত্রপত্রিকার শিরোনামে আসে নাই। সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে ভাইরাল হইয়াছে। কলকাতার অনতিদূরে ডায়মন্ডহারবারের নজাহারি এলাকা থেকে হিন্দু বিতারণ চলিতেছে। অভিযোগ, মসজিদের মাইক হইতে ঘোষণা করিয়া হিন্দুদের এলাকা ছাড়িবার নির্দেশ দেওয়া হইতেছে। বেশ কয়েক দিন ধরিয়াই ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চল হইতে হিন্দু বিতাড়ন চলিতেছে তৃণমূল প্রার্থীর নির্দেশে। একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি সংবাদপত্রের সূত্র অনুযায়ী, নজাহারি অঞ্চলের প্রাক্তন প্রধানের স্বামী দলবল লইয়া হিন্দুদের উপর হামলা চালাইয়াছে। ইহাতে তৃণমূলের হিন্দু সদস্যরাও রেহাই পান নাই। এই অপকর্মকেই আড়াল করিবার মানসে সেইদিন অমিত শাহের উপর আক্রমণ সংঘটিত করা হইয়াছিল। মাত্র দেড় দশক পূর্বে এইভাবেই কাশ্মীরকে হিন্দুশূন্য করা হইয়াছে। প্রশ্ন উঠিতেছে, পশ্চিমবঙ্গ কি পরবর্তী কাশ্মীর হইতে চলিয়াছে? দলমত নির্বিশেষে সমস্ত হিন্দুদের আজ ভাবিতে হইবে পশ্চিমবঙ্গকে কোন সর্বনাশের দিকে লইয়া যাইতেছেন তৃণমূলনেত্রী?

সুভাষিতম্

চিন্তনীয়া হি বিপদাং আদাবেব প্রতিক্রিয়া।
ন কূপখননং যুক্তং প্রদীপ্ত বহ্নিনা গৃহে।।

ঘরে আগুন লাগার পর কুয়ো খুড়তে শুরু করা যেমন যুক্তিযুক্ত নয়, তেমনি বিপদ কেটে যাওয়ার পর চিন্তা করা কোনও কাজের কথা নয়।

পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাকি ভারতের মেলবন্ধন করলেন নরেন্দ্র মোদী

বিশ্বামিত্র-র কলম

এই প্রতিবেদন যখন প্রকাশিত হবে তখন ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হয়ে যাবে। আপাতত একজিট পোলের যা গতিবিধি তাতে দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসতে নরেন্দ্র মোদীর বিন্দুমাত্র অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। পশ্চিমবঙ্গেও ভালোই ফল করবে বিজেপি। একজিট পোল তাই জানাচ্ছে। পাঠক যখন পড়বেন তখন স্পষ্ট হয়ে যাবে ঠিক কতগুলি আসন এরাজ্যে বিজেপি পেল। প্রধানমন্ত্রী তাঁর প্রচারসূচিতে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন দুটি রাজ্যকে। একটি পশ্চিমবঙ্গ, দ্বিতীয়টি উত্তরপ্রদেশ। উত্তরপ্রদেশ ভারতের সরকার গড়ার অন্যতম চাবিকাঠি। সর্ববৃহৎ এই রাজ্যের ৮০টি আসনের ফলাফলের ওপর দিল্লির কুর্সি অনেকটাই নির্ভরশীল। গত লোকসভায় ৭৩টি আসন এই রাজ্য থেকে পেয়েছিল বিজেপি। সুতরাং উত্তরপ্রদেশকে বাড়তি গুরুত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দিতেই পারেন। এও ভাবতে হবে যে, এই রাজ্যে মায়াবতী-অখিলেশের যে ভোট হয়েছে তা স্রেফ বহুজন সমাজবাদী পার্টি-সমাজবাদী পার্টির অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে, গতবার যাদের ঝুলিতে যথাক্রমে শূন্য ও পাঁচটি আসন গিয়েছিল। তার ওপরে গান্ধী পরিবারের একদা পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত উত্তরপ্রদেশে এখন জাতীয়তার হাওয়া বইছে, তাকেও সম্মান জানাতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

কিন্তু হঠাৎ পশ্চিমবঙ্গে তাঁর বারবার আসা-যাওয়া কেন? তৃণমূলের ভাষায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা। এবিষয়ে রাজনৈতিক মহলে দুটি ব্যাখ্যা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এক নম্বর, প্রধানমন্ত্রী পদের অন্যতম দাবিদার, সেই ভাগ্য শিকে না ছিঁড়লেও বিরোধী জোট (মতান্তরে ঘোঁট)-এর অন্যতম মুখ তো বটেই এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, সুতরাং তাঁর সঙ্গে টক্কর দিতেই ভোটপ্রচারে এরাজ্যে ঘনঘন যাতায়াত মোদীর। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা, উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি রাজ্যে বিজেপির আসন সংখ্যা কমবে বুঝেই সেই ঘাটতি পূরণে নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবঙ্গে জোর দিয়েছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষণ যে যার মতো করতেই পারেন, কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু মমতাদেবীর প্রস্তাবিত আসন সংখ্যা ৪২ উলটে গিয়ে ২৪ হয়ে গেলেও তাঁর গলাবাজি খবু একটা কমবে না এবং তাঁর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত মিডিয়াকুল যত রাজ্যের অপযুক্তি সাজিয়ে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার না হোক অন্তত মোদীর প্রতিপক্ষ রূপে খাড়া করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখবে না।

সমস্যা তা নিয়ে নয়। সমস্যা হলো পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সাংগঠনিক জোর তেমন নয়, বরং প্রতিপক্ষ শাসক দলের গাজোয়ারি অগণতান্ত্রিক মনোভাব আর সেই সঙ্গে প্রশাসনিক পক্ষপাতদুষ্টতা, অনৈতিকতা এবং যেনতেনপ্রকারেণ ৪২-এ ৪২ করবার জন্য যতদূর যেতে হয় তা যাওয়া, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও নির্বাচন কমিশনকেও একপ্রকার ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করার আশঙ্কা সত্ত্বেও মোদী আর সব রাজ্যকে পিছনে ফেলে হাজার প্রতিকূলতা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ প্রধানমন্ত্রী সঠিক ভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদ আর পশ্চিমবঙ্গের বিচ্ছিন্নতাবাদ একবিন্দুতে এসে এখন মিলে গিয়েছে।

এরাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর ভোটপ্রচার নিছক দলীয় রাজনৈতিক প্রচার ছিল না। প্রতিটি সভা থেকে তিনি দেশপ্রেমের কথা বলেছেন। অন্যদিকে বিরোধীরা, যাদের নেতৃত্বে রয়েছেন মমতা ব্যানার্জি ,নিছক রাজনৈতিক স্বার্থে তারা দেশের স্বার্থ কীভাবে উপেক্ষা করতে পারেন, প্রধানমন্ত্রী সেই দৃষ্টান্তও দিয়েছেন। রাজনৈতিক প্রচার বলতে আমাদের ধারণায় মেঠো প্রচারই বোঝায়। কিন্তু প্রবল দাবদাহে প্রধানমন্ত্রীর প্রচারে এরাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে গলদঘর্ম হয়েছেন তাতে কিছু প্রশ্ন উঠবেই। গণতান্ত্রিক দেশে যে কেউ প্রচারে যেখানে খুশি যেতে পারেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার অজুহাতে 'গণতন্ত্র বাঁচাও যাত্রা' বাতিল করা থেকে বিজেপির সমস্ত রাজনৈতিক কর্মসূচি যখন বানচাল করছে রাজ্য প্রশাসন, এই রাজ্যের 'বুদ্ধিজীবী' নামধারীরা তখন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়েছেন এক কল্পিত 'সাম্প্রদায়িকতা'-কে রুখবার তাড়নায়। রাজ্যবাসী এতটা বোকা নন, দেশভাগের সবচেয়ে নিদারুণ ক্ষত এই পশ্চিমবঙ্গে, পঞ্জাব তবু জনবিনিময়ের সুযোগ পেয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যে সেটুকুও জোটেনি। আমও গেছে, ছালাও গেছে। সুতরাং ইসলামিক সাম্প্রদায়িকতার বিপদ পশ্চিমবঙ্গ ও হিন্দু বাঙ্গালি জানে। তাই যখন হিন্দু থেকে মুসলমানে পরিণত এক গায়ক তীব্র হিন্দুবিরোধী প্রচার করেন, কিংবা স্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করা কট্টর বাম থেকে কট্টর তৃণমূলি কবি বাংলাদেশ সরকারের কাছে আর্জি রাখেন ' তসলিমাকে নিয়ে গিয়ে বরং একশো ভিখিরি পাঠান' বা মমতাজীবী এক কবি যখন ত্রিশূলে কন্ডোম পরান , তখন হিন্দু বাঙ্গালি এদের চিনে নেন খুব ভালো করে। তাই প্রাদেশিক উগ্রতাকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ মনেপ্রাণে বর্জন করেছে। সারা ভারতের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের এই মেলবন্ধনের সেতুটি বেঁধে দিয়ে গেলেন নরেন্দ্র মোদী। ■

এ লজ্জা কোথায় রাখবো?

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

অতি দীর্ঘ এক নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হলো। গোটা দেশে ভোট হলো। কীভাবে হলো আমরা সবাই দেখলাম। গোলমাল শুধু পশ্চিমবঙ্গে। এখানকার পরিবেশ এত ভালো যে, প্রায় প্রত্যেকটি দফার ভোটে হিংসাত্মক ছবি উঠে এল। নির্বাচন কমিশনের এত সতর্কতা, এত নজরদারি, এত কেন্দ্রীয় বাহিনী সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন রক্তাক্তই থাকল।

এই পরিস্থিতি আর কতদিন চলবে? আমাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। গোটা ভারত শান্তিতে ভোট সম্পন্ন করতে পারে আর আমরা পারি না? এ লজ্জা রাখবো কোথায়? এবার কিন্তু এসপার-ওসপারের সময় এসেছে। গণতন্ত্রের পথে হাঁটার প্রশ্নে আমরা কি ভারতের মূল স্রোতে শামিল হতে পারব? নাকি নিজেদের 'রক্তাক্ত ঐতিহ্য'-এ অটল থাকব? সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসেছে।

ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর 'অতিসক্রিয়তা' নিয়ে প্রথম থেকেই সরব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বারবারই তিনি অভিযোগ করেছেন, বিজেপি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রাজ্যে এত সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেছে এবং কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোকে ভোটের স্বার্থে ব্যবহার করছে। কিন্তু যদি ব্যবহার না করা হতো তাতে আরও কত রক্ত ঝরত কে জানে। ২০১১ সালে কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল বলেই দিদি ভোটে জিতেছিলেন। আজ তিনিই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে গালাগাল দিচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনকেও নিশানা করেছেন। এমনই তাঁর অহংকার। কিন্তু সত্যিই কি আমাদের অহংকারের কোনও জায়গা আছে?

প্রায় সর্বত্র বিরোধী প্রার্থীদের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। কোথাও বিরোধীরা ভোট প্রক্রিয়ায় ভালোভাবে অংশ নিতে পারেননি। মিটিং মিছিলে বাধা তো ছিলই, সেই সঙ্গে আক্রান্তও হতে হয়েছে বার বার। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন যেভাবে এই রাজ্যের ভোট সামলেছেন তাকে সাধুবাদ দিতেই হবে।

এর পরে আবার ইভিএম নিয়ে বিতর্ক। ব্যালট পেপার থেকে ইভিএম। ভারতে এই যাত্রাটাও সহজ ছিল না। ব্যালট পেপারের সময়ে ছাপ্পা ভোট থেকে গণনায় কারচুপির অভিযোগ ছিল। অনেক বেশি। দেশে সবার আগে এই পদ্ধতি বদলের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবার ইভিএম থেকে ব্যালটে ফিরে যাওয়ার দাবিতে সবার থেকে বেশি সরব তিনি। আসলে শাসক বনাম বিরোধীর লড়াইয়ে কাঠগড়ায় বারবার উঠতে হয় ব্যালট কিংবা ইভিএমকে।

ব্যালট পেপারকে বিদায় জানিয়ে ইভিএম বেছে নেওয়ার পরেও উঠতে শুরু করে নানা অভিযোগ। তার প্রেক্ষিতে ২০১০ সালে ভারতের নির্বাচন কমিশন একটি টেকনিক্যাল টিম তৈরি করে, যার কাজ ছিল ইভিএমকে আরও স্বচ্ছ এবং নিরাপদ করে তোলা। সবকটি রাজনৈতিক দলের সুপারিশ মতো একটি কাগজ যুক্ত ইউনিট প্রস্তুত হয় যা একটি স্লিপ ইস্যু করে ভোটদানের সঙ্গে সঙ্গেই। ২০১৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট ইভিএমের সঙ্গে এই ভিভিপ্যাট ব্যবহারের নির্দেশ দেয়।

মূল ইভিএম কাগজ বিহীন ছিল। ২০১৩ সালের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরে নির্বাচন কমিশন দেশের সমস্ত বুথে ভোটার ভেরিফায়েড পেপার অডিট ট্রেল বা ভিভিপ্যাটের ব্যবহার করল এই প্রথম। তার পরেও অভিযোগ। একেই বলে নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। সত্যি লজ্জা, অনেক লজ্জা এই পশ্চিমবঙ্গের।

— **সুন্দর মৌলিক**

উত্তরাধিকারের ঢাক পেটালে তার ক্ষতিকারক প্রভাব পড়ে

অতিথি কলম



বৈভব পুরন্দরে

সম্প্রতি দিল্লির নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়মে গিয়ে আমার মনে পড়ল নেহরুর মৃত্যুর পর তাঁর স্বাভাবিক রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী লালবাহাদুর শাস্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসস্থান 'তিনমূর্তি ভবনে' ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ইন্দিরা গান্ধী এই বাড়িটিকে তাঁর বাবার স্মৃতিভবন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে দেশের নতুন প্রধানমন্ত্রীকে আটকে দেন।

এই তিনমূর্তি ভবন কিন্তু ৩০ একরের বিশাল এক ভূমিখণ্ড। যেখানে এখনও ময়ূর নাচে, ময়না গান গায়। সেটি ছিল পরাধীন ভারতে ইংরেজ সেনাবাহিনীর প্রধানের আবাসস্থল। ১৯৪৮ সালেই নেহরু এখানে প্রবেশ করেন যা কিনা চাকচিক্যে বিশালতায় তাঁর সহকর্মী অন্যান্য মন্ত্রীদের বাসভবনের তুলনায় আকাশ পাতাল তফাতের। লক্ষণীয়, এখানে আসার আগে পর্যন্ত তাঁর জন্য নির্দিষ্ট বাঙলোতেই তিনি থাকতেন।

অতীতের একটা অলৌকিক ক্ষমতা আছে হঠাৎ করে বর্তমানের ওপর ছায়া ফেলার। ১৯৬৪ সালে লাল বাহাদুরকে বঞ্চিত করার এই ঘটনা তেমনি ছায়াপাত ঘটাল। রাহুল গান্ধী তাঁর নির্বাচনী বক্তৃতাগুলিতে প্রায়শই বলছেন, সেনাবাহিনী কখনই প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। সত্য ঘটনা হলো, রাহুলের বোঝা উচিত অতীতের যেমন বর্তমানকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রয়েছে অনাগত ভবিষ্যতের ওপরও রয়েছে তার নিয়ন্ত্রণ।

২০০৪ সালে আমেথি লোকসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য রাহুল গান্ধীকে নেহরু-গান্ধী পরিবারের একজন প্রতিনিধি হিসেবেই মনোনীত করা হয়। কালক্রমে সম্পাদক ও সহ-সভাপতির পদ পেরিয়ে তিনি তাঁর জন্য পূর্ব নির্দিষ্ট কংগ্রেস সভাপতির পদে বসেন। তিনি হলেন পারিবারিক উত্তরাধিকারী হিসেবে পঞ্চাশতম ব্যক্তি যিনি এই দলীয় সর্বোচ্চ পদে আসীন। আর আজকে তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ারও যে বাসনা পোষণ করছেন তা কেবলমাত্র প্রাক্তন কোনো প্রধানমন্ত্রীর পুত্র বা নাতি বা দৌহিত্র হওয়ার সুবাদে। এই সুবাদে তিনি যদি এক তরফা তাঁর বংশ লতিকার গুণগানে মত্ত থাকেন তখন বিরোধীদেরও এটা স্বাভাবিক অধিকার জন্মায় যে সেই বংশধরের কাজকর্মের কীর্তিকাহিনির সমালোচনা করার।

কংগ্রেস দল যদি নেহরুর দূরদৃষ্টি, ইন্দিরা গান্ধীর দৃঢ়তা বা রাজীব গান্ধীর ভারতকে কম্পিউটার জমানার দিকে এগিয়ে দেওয়া নিয়ে গুণগান করতে পারেন, সেক্ষেত্রে বিরোধীরাও তাদের ভুলগুলো খুঁজে জনতার কাছে তুলে ধরবেই। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী পদ (নরসিমহা রাও, দেবেগৌড়া, গুজরাল, মনমোহন প্রমুখ ছাড়া) ৫০ বছর যদি তাঁদেরই বংশের কুক্ষিগত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে অর্থনীতির পরিভাষায় কাজকর্মের অডিট করানো বাধ্যতামূলক। সেই কারণেই

> "তর্কযুদ্ধ করতে গেলে তা নির্দিষ্ট পরিসরেই করতে হবে। সাদা কালো দুটিকেই স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে নিয়ে আসতে হবে। তাই নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন দীর্ঘদিনের নেহরু - গান্ধী পরিবারের বহতা বংশবাদের ধারা নিয়ে বিতর্ক চলার পর্যাপ্ত যুক্তি থেকেই যায়।"

যারা নেহরু গান্ধী পরিবারতন্ত্রের ওপর আরোপিত বিরোধীদের অভিযোগগুলি নিয়ে খেপে উঠছেন তাঁরা এই পর্যালোচনা করার অধিকারটিকেই কেড়ে নিতে চাইছেন বা পক্ষান্তরে ওই বংশবাদীদের স্বপক্ষে দেওয়া আমার যুক্তিগুলিকে মান্যতা দিচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে বামপন্থী উদারবাদীরা অর্থাৎ তথাকথিত সামাজিক- রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা, যাদের এই পরিবার সযত্নে লালন করে এসেছে তারা এই পরিবারের বিশেষ কোনো আলোচনা ততক্ষণ পর্যন্তই মেনে নেবে যতক্ষণ তা এই পরিবারের উত্তরাধিকারীর ভাবমূর্তির পক্ষে ক্ষতিকারক হবে না।

এই সূত্রে যখনই রাহুল বা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তাঁদের আত্মীয় স্বজনদের দেশের জন্য মহান অবদানের কথা তুলে ধরেন তখন এই ধামাধরা লোকজন এ প্রসঙ্গে আরও বেশি বেশি করে শুনতে চান।

মার্কসবাদীরা নিপুণভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে একটি অলিখিত চুক্তির মাধ্যমে দেশের সমস্ত রকমের বৌদ্ধিক চর্চা ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলিকে কবজা করে এর মাধ্যমে নেহরুর উত্তরাধিকারের গুণগান করার এক মনোমতো narrative খাড়া করেছিল। রাহুল পরিবারের ঊর্ধ্বতনদের মহিমা কীর্তন করলে এরা স্বভাবতই আহ্লাদিত হন, কেননা এঁরা পালিত।

কংগ্রেস ও বামবাদীরা পারম্পরিকভাবে তথা যোগসাজসে ভারতের 'সাংস্কৃতিক চিন্তনের' ক্ষেত্রে একটা নিজস্ব ভুবন তৈরি করেছিল যাতে মনে হয় নেহরু গান্ধী পরিবারই চিরন্তন ভারতীয় চেতনার ধারক ও বাহক। দেশব্যাপী পাঠ্যপুস্তকগুলি লেখা হতো এমনভাবে যেখানে ভারত গঠনে কেবলমাত্র এই পরিবারের ভূমিকাই শুধু উদ্ভাসিত হয়।



এলাহাবাদের তিনমূর্তি ভবন।

অন্যান্য দেশপ্রেমীদের কর্মকাণ্ড থাকে উপেক্ষিত। আর এই উত্তরাধিকারকে চিরস্থায়ী করতে রাস্তা, ঘাট, স্থান, দ্রষ্টব্য প্রতিষ্ঠান, উল্লেখযোগ্য কোনো কেন্দ্র, জাতীয় গুরুত্বের যা কিছু সবই এদের নামে উৎসর্গীকৃত হয়। পরিবারটি হয়ে ওঠে জনস্মৃতিতে অক্ষয়, অমর। যে সমস্ত পোষিত উদারপন্থীরা এদের ছাতা ধরে চলতেন তাঁরা এতদূর পর্যন্ত গেলেন যে অতীত সামন্ত্রতান্ত্রিক প্রথা মেনে পরিবারটিকে দেশের 'first family' আখ্যা দিয়ে বসলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবীরা, সমাজসংস্কারকের দল এমনকী কংগ্রেসের সর্দার প্যাটেলের মতো মহীরুহকে পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদা দেওয়া হলো। আর হ্যাঁ, যদি বলেন তাহলে মহাত্মা গান্ধীকে কেন এখনও এত বরণীয় স্থলে রাখা হয়? স্বার্থ, নিটোল স্বার্থ। তাঁর নামকে ব্যবহার করে বিশেষ করে তাঁর পদবিটা এই বংশবাদীদের খুব কাজে লাগে। অবশ্যই রাহুল বা প্রিয়াঙ্কাকে ব্যক্তিগতভাবে দোষ দেওয়া যাবে না যে তাদের এমন পরিবারে জন্ম হয়েছে বলে। তবে তারাও যতক্ষণ মানুষ তাদের প্রশংসায় ভরিয়ে রাখছে বা তাদের পরিবারের মাহাত্ম্যে মগ্ন হয়ে থাকছে তারা খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারতন্ত্র তাঁর নখ দাঁত সব সময় প্রস্তুত রাখে। তারা যেমন চাটুকারিতা ভালোবাসে কিন্তু তা থেকে বিচ্যুতি ঘটলেই শাস্তির খাঁড়া নেমে আসে। যেমন নরসিমহা রাও তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় ছিলেন সদা অস্থির ও অপমানিত। তাঁর মৃতদেহ পর্যন্ত দিল্লিতে সৎকার করতে দেওয়া হয়নি।

একটা কথা মনে রাখা দরকার বিরোধীদের দোষ দেওয়ার আগে পরিবারবাদীদের মনে রাখতে হবে তাঁরাও কিন্তু কথাবার্তার ক্ষেত্রে সঠিক মাত্রাজ্ঞান রাখতে জানেন না বা রাখেন না। কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে রাহুল গান্ধী তাঁর প্রথম বক্তব্যে বীর সাভারকারকে ব্রিটিশের পদলেহী বলেছিলেন। তিনি এই বক্তব্যে বরাবর অবিচল থেকেছেন। তাঁর Twitter-এ পাকাপাকিভাবে চিহ্নিত করা আছে সাভারকার একজন বিশ্বাসঘাতক। ইতিহাসের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে রাহুলের জ্ঞান যথার্থই অগাধ! সেই কারণেই বর্তমান নির্বাচিত সরকার সম্পর্কে তাঁর নির্বোধ উচ্চারণ, ভারত একনায়কতন্ত্রের যুগে প্রবেশ করছে। তাঁর অনুচররা মনে করিয়ে দেয় যে, 'সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্র' বলতে হবে। তিনি হয়তো বোঝাতে চান একজন ব্যক্তি নেতা হিসেবে অবিমিশ্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠছেন। তাঁর ইতিহাস জ্ঞানে কুলোয় না যে তাঁর ঠাকুমা যখন সারা ভারতে অসাংবিধানিক জরুরি অবস্থা জারি করার ক্ষমতা ধরেছিলেন তখন তাঁর চাটুকার দেবকান্ত বরুয়া বলেছিলেন 'India is Indira, Indira is India'। কিংবা রাহুল যখন গরিবি হটাও স্লোগান তোলেন তখন ৫০ বছর আগে ইন্দিরা গান্ধীর একই ধ্বনির প্রসঙ্গে দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতিধ্বনি হয়। জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালে ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিপুল যুদ্ধ হয়। এর গৌরবগান করতে গেলে ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধে পর্যদুস্ত হওয়ার কারণও বিশ্লেষণ করা দরকার।

ঠিক তেমনি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে নির্মোহ আলোচনা করতে গেলে আসবে শাহবানু মামলার পরবর্তী রাজীব গান্ধীর সংবিধান সংশোধন, দেশে সলমন রুশদির 'স্যাটানিক ভার্সেস' নিষিদ্ধ করা বা বিতর্কিত বাবরি ধাঁচার তালা খুলে দেওয়ার প্রসঙ্গ।

তর্কযুদ্ধ করতে গেলে তা নির্দিষ্ট পরিসরেই করতে হবে। সাদা কালো দুটিকেই স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে নিয়ে আসতে হবে। তাই নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক না কেন দীর্ঘদিনের নেহরু গান্ধী পরিবারের বহতা বংশবাদের ধারা নিয়ে বিতর্ক চলার পর্যাপ্ত যুক্তি থেকেই যায়।

(লেখক টাইমস অব ইন্ডিয়ার কলাম লেখক)

রম্যরচনা

ক্লাসে পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে

রাম ১০০-তে ৯০ পেয়ে ক্লাসে প্রথম হয়েছে।

পাপ্পু ১০০-তে ৩০ পেয়েছে।

মমতা ১০০-তে ৩২ পেয়েছে।

সীতারাম ১০০-তে ৩৩ পেয়েছে।

প্রধান শিক্ষক রামকে পুরস্কার তুলে দিতে যাবে ঠিক সেই সময় লাস্ট বেঞ্চ থেকে তিন বন্ধু বাপ্পু, মমতা আর সীতরাম সামনে এসে হেডস্যারকে বললো—

'ওই পুরস্কার আমাদের কারণ আমরা তিনজন মিলিত ভাবে সর্বোচ্চ (৩০+৩২+৩৩)=৯৫ পেয়েছি'।

হেডস্যার বললো তোমরা তিনজনে মিলে পেয়েছো কিন্তু রাম একাই পেয়েছে ৯০। তাই পুরস্কার তোমাদের কীভাবে হয়?

তখন তিন ছাত্র বলল আমাদের দেশের রাজনীতিতে যদি কম আসন পাওয়া, হেরে যাওয়ারা মিলিত হয়ে সরকার গড়তে পারে তাহলে ছাত্রদের বেলায় হবে না কেন? নেতাদের এক নিয়ম আর ছাত্রদের জন্য অন্য নিয়ম কেন?



উবাচ



"ভারতে নির্বাচন শেষ হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী ও বিজেপিকে অভিনন্দন জানাই। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, মালদ্বীপের মানুষ ও সরকার প্রধানমন্ত্রী মোদী ও বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার আনন্দলাভ করবে।"

মহম্মদ নশির
মালদ্বীপের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি

বুথ ফেরত সমীক্ষার প্রেক্ষিতে



"নরেন্দ্র মোদী খুবই ধার্মিক মানুষ। তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করলে কোনও দোষ দেখি না। এতে বিরোধীদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

কে সি ত্যাগী
জেডিইউ নেতা

বিরোধীদের কটাক্ষের পরিপ্রেক্ষিতে



"প্রধানমন্ত্রী ৪০ জনের কথা বলেছিলেন। আমার কাছে ১০০ জন বিধায়কের খবর আছে। যাঁরা আমাদের দলে আসতে চান তাদের সাদরে গ্রহণ করব। আমি নিশ্চিত, ২০২১ পর্যন্ত তৃণমূল টিকবে না।"

দিলীপ ঘোষ
রাজ্য বিজেপির সভাপতি

দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে



"যখন অনেক বুথফেরত সমীক্ষা একই বার্তা দেয়, আসল ফলও সেই দিকেই এগোয়। যদি এই সমীক্ষার সঙ্গে আসল ফল মিলে যায় তাহলে প্রমাণ হবে ইভিএম নিয়ে বিরোধীরা এতদিন ভুয়ো প্রচার চালাচ্ছিল।"

অরুণ জেটলি
বিজেপি নেতা

বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল প্রসঙ্গে

ভারতবর্ষে প্রধানমন্ত্রীর মনোনয়ন

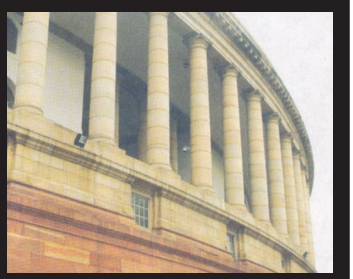
এবারের লোকসভা নির্বাচন সম্প্রতি শেষ হয়েছে। তার গুরুত্ব অপরিসীম। তার কারণ এই নির্বাচনের মধ্য দিয়েই ঠিক হবে কোন দল বা গোষ্ঠী কেন্দ্রে সরকার গঠন করবে।

তাৎপর্যের বিষয় হলো— প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই সরকার গঠিত হয়। কিন্তু কীভাবে প্রধানমন্ত্রীকে মনোনীত করা হবে, সেই বিষয়ে সংবিধান স্পষ্ট করে কিছু লেখেনি। ৭৫(১) নং অনুচ্ছেদে আছে— "The Prime Minister shall be appointed by the President and other Minister shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister"। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শেই অন্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করবেন, কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে কি দেখে তিনি মনোনীত করবেন, সেটা আমাদের জানা নেই।

তবে ৭৫(২) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "The Ministers shall head office during the pleasure of the President"। আর ৭৫(৩) নং অনুচ্ছেদে আছে "The Council of Minister shall be collectively responsible to the house of the people"। মন্ত্রীরা ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী— তবে লোকসভার আস্থা হারালে মন্ত্রীসভাকে যৌথভাবে বিদায় নিতেই হবে।

সুতরাং বলা চলে, প্রধানমন্ত্রীকে লোকসভার আস্থাভাজন হতেই হবে। তাই সাধারণত লোকসভার একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা-নেত্রীকেই উক্ত পদের জন্য বেছে নেওয়া হয়। কারণ তিনি ছাড়া আর কারও পক্ষেই লোকসভার আস্থা অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে প্রধানমন্ত্রী (এবং অন্যান্য) মন্ত্রীদের পার্লামেন্টের যে কোনও কক্ষের সদস্য হতেই হবে। ৭৫(৫) নং অনুচ্ছেদে আছে, কার্যভার গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে বহিরাগত মন্ত্রীকে কোনও একটা কক্ষের সদস্য হতেই হবে, নতুবা তিনি বিদায় নেবেন।

অবশ্য যদি লোকসভায় কোনও দল / গোষ্ঠী নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা না পায়, তবে রাষ্ট্রপতি যেমন বৃহত্তম দলের নেতা বা নেত্রীকে সুযোগ দিতে পারেন, তেমনি বড় দলের দ্বারা সমর্থিত সংখ্যালঘু সরকার গড়তে দলের বা কোয়ালিশন মন্ত্রীসভাকে সুযোগ দিতে পারেন। কিন্তু "When a single party has a clear mojority in the Lok Sabha, the President must invite its leader to form the Government" (ড: হরিহর দাস — ইণ্ডিয়া : ডেমোক্রেটিক গভর্ণমেন্ট অ্যাণ্ড পলিটিক্স, পৃ : ১৯৩)।



প্রধানমন্ত্রীকে লোকসভার আস্থাভাজন হতেই হবে। তাই সাধারণত লোকসভার একক গরিষ্ঠ দলের নেতা-নেত্রীকেই উক্ত পদের জন্য বেছে নেওয়া হয়। কারণ তিনি ছাড়া আর কারও পক্ষেই লোকসভার আস্থা অর্জন করা সম্ভব নয়।

সমানভাবে ড: বি সি রাউত লিখেছেন, "Only when are several parties in the house and one command and a clear majority, the President may have some freedom of choice" (ডেমোক্রেটিক কন্সটিটিউশন অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ১২৮)। অবশ্যই তিনি যে কোনও ব্যক্তিকে সেই পদে বসিয়ে দিতে পারেন, তাঁর গরিষ্ঠতা আছে কিনা সেটা পরবর্তী ব্যাপার। কিন্তু রাষ্ট্রপতির পক্ষে সহজ ব্যাপার হবে বিষয়টা আগে দেখে নেওয়া, কাজটা "delicate and difficult - " (ড: এস সি কাশ্যপ— আওয়ার কন্সটিটিউশন, পৃঃ ১৫৮)।

তাছাড়া তিনি যদি সংসদের দুই কক্ষের বাইরে থেকে প্রধানমন্ত্রীকে বেছে নেন (যেমন দেবেগৌড়া), তাহলে একটা শর্ত থেকেই যায়— কোনও কক্ষের সদস্য না হলে "a Minister shall lose his office" তাঁর মেয়াদ হবে মাত্র ছয় মাস (ড: জে সি জোহরী— দ্য ইন্ডিয়ান কন্সটিটিউশন, পৃঃ ৩২৯)।

এটা লক্ষণীয় যে, আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত কংগ্রেসের একাধিপত্য ছিল। তার ফলে সংসদের দুই কক্ষ ও রাজ্যে রাজ্যে ওই দল প্রাধান্য বিস্তার করেছে। নেহরুর আমলে তিনবার কংগ্রেস লোকসভার যথাক্রমে ৩৬৪, ৩৭১ ও ৩৬৯টি আসন পাওয়ায় একক গরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবেই তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন।

চতুর্থবার (১৯৬৭) কংগ্রেসের আসন কমলেও সেটা ছিল ২৮৩। কংগ্রেসের ভাঙনের পর ইন্দিরা গান্ধীর পেছনে ছিলেন মাত্র ১৪০ জন সদস্য। কিন্তু সিপিআই, সমাজতান্ত্রিক দল ইত্যাদির সাহায্যে তিনি গদি বাঁচিয়েছেন— (কল্যাণ রায়— ইন্দিরা গান্ধী, পৃঃ ১৩৪)। ১৯৭৭ সালে কংগ্রেসের বিপর্যয়ের (লোকসভায় মাত্র ১৫৪টা আসন) পর সেই প্রথম 'জনতা দল' সরকার গঠন করে। কিন্তু দলের ভাঙনের ফলে সরকার টেকেনি। ১৯৭৯ সালে দলছুট নেতা চরণ সিংহ প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন কংগ্রেসের সাহায্য নিয়ে, কিন্তু ২৪ দিন পরে তাঁকেও বিদায় নিতে হয়েছে। শুরু হয়েছে অন্যদের সাহায্যপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীদের আগমন। ভি পি সিংহ এবং চন্দ্রশেখর অল্প দিন ক্ষমতায় ছিলেন। অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রথম সরকারও (১৯৯৮) মাত্র ১২ দিন ক্ষমতায় ছিল। দেবেগৌড়া, গুজরালও সরকার টেকাতে পারেননি। বাজপেয়ীর দ্বিতীয় সরকারও একক গরিষ্ঠ ছিল না বলে মেয়াদ শেষ করতে পারেনি। তবে মনমোহন সিংহয়ের ইউ পি এ এবং বাজপেয়ী এবং নরেন্দ্র মোদীর এন ডি এ পূর্ণ সময় কাজ করতে পেরেছে।

বলা বাহুল্য, সংখ্যালঘু সরকার আদৌ টেকসই হয়নি। আর রাজীব গান্ধীর পর (লোকসভায় রেকর্ড সংখ্যক ৪১২টা আসন) একক দলের সরকারও গড়ে ওঠেনি। এখন চলছে জোট সরকারের যুগ।

আসলে এই রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে কোনও কোনও সময় রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা প্রাধান্য বিস্তার করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৭৯ সালের কথাই ধরা যাক। মোরারজী দেশাই পদত্যাগ করলে তাঁর দলেরই জগজীবন রাম ওই পদে প্রার্থী হন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডী দলছুট এবং নবগঠিত লোকদলের নেতা চরণ সিংহকে সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ২৪ দিন পরে চরণ সিংহ পদত্যাগ করলে আবার জগজীবন রাম প্রার্থী হন। এবার রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিয়ে মধ্যবর্তী নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন এবং তাতে বিরাট প্রাধান্য নিয়ে কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন। জগজীবন রামের পক্ষে জীবনে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ ঘটেনি।

প্রথম ইউ পি এ-র সময়ও কি তেমন কিছু হয়েছিল? কারণ গোষ্ঠী নেত্রী হিসেবে সোনিয়া গান্ধী রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়েছিলেন হঠাৎ তিনি মনমোহন সিংহয়ের নাম প্রস্তাব করেছেন কেন?

তবে এটা ঠিক যে, এই ব্যাপারে লোকসভা নির্বাচনের একটা বিরাট ভূমিকা আছে। কারণ "The President has to invite the leader of the majority party in the Lok Sabha"(এস এল সিক্রির ইণ্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃঃ ১১৯)।

এক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রথাও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। অতীতে বহু লর্ড প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু ১৯২৩ সালের একটা ঘটনা কম সংখ্যার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী বোলার স্বাস্থ্যের কারণে পদত্যাগ করায় লর্ড কার্জন ও স্ট্যানলি বল্ডউইন ওই পদের প্রার্থী হন। ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতা, খ্যাতি ইত্যাদির দিক থেকে লর্ড কার্জন ছিলেন অবশ্যই অগ্রণী। কিন্তু রাজা পঞ্চম জর্জ বল্ডউইনকেই বেছে নিয়েছেন। সেই থেকে প্রথা অনুসারে এই ব্যাপারে প্রাধান্য স্বাভাবিকভাবেই। ১৯৬৩ সালে অবশ্য লর্ড হিউমকে আহ্বান করা হয়, কিন্তু প্রথাটা ভাঙা হয়নি। কারণ তিনি তখন নিম্নকক্ষের থেকে এসেছিলেন।

আমাদের এখানেও এই ধরনের প্রথা গড়ে উঠেছে। ইন্দিরা গান্ধী প্রথমবার (১৯৬৬) রাজ্যসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী হলেও পরে (১৯৭১, ১৯৮১) এসেছেন লোকসভা থেকেই। অন্যান্যরা ছিলেন লোকসভার সদস্য।

এই সব কারণে তাই বলা যায়, লোকসভায় নির্বাচনেই এই ব্যাপারটা নির্ধারণ হবে। যদি এন ডি এ গরিষ্ঠতা পায়, তাহলে নরেন্দ্র মোদীই প্রধানমন্ত্রী হবেন। বিরোধীরা অবশ্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছে। তবে তেমন ফ্রন্ট গড়ে ওঠেনি। আর এই ধরনের সুবিধাবাদী ঐক্য অস্থিরতারই সৃষ্টি করে বলে অনেক ভোটারই জানেন। 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে' কথাগুলো এক্ষেত্রে খাটে না। ▌

বিজ্ঞপ্তি

ডাকযোগে যাঁরা নিয়মিত স্বস্তিকা পাচ্ছেন না তাঁরা তাঁদের স্থানীয় ডাক বিভাগে এবিষয়ে লিখিত অভিযোগ করুন। এবং তাঁর এক কপি সেখানকার পোস্টমাস্টারকে দিয়ে 'রিসিভ' করান। ঐ রিসিভ কপিটি স্বস্তিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিন যাতে আমরা এখানে বিষয়টি জানাতে পারি।

প্রচার প্রমুখ
স্বস্তিকা

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর

3 in 1 Account

(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
Find us on Facebook
E-mail : drsinvestment@gmail.com

হিন্দুত্বই ভারতের অন্তরাত্মা

ড. মনমোহন বৈদ্য



যুগযুগ ধরে ভারতে এক অসাধারণ জীবন দর্শন প্রবহমান যা একাত্ম ও সমগ্র। কারণ তার ভিত্তি আধ্যাত্মিকতা। ভারত বিশ্বাস করে যে 'সত্যে' পৌঁছনোর বিভিন্ন রূপ, নাম ও পথ থাকতে পারে। বিচিত্র হলেও এই সব পথই সমান। ভারত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রত্যক্ষ করে এবং ঐক্য স্থাপনে সক্ষম। সে বৈচিত্র্যকে পার্থক্য মনে করে না। এই আধ্যাত্মিকতা আমাদের শিক্ষা দেয় যে প্রত্যেক আত্মাই সুপ্তভাবে দিব্য এবং সেই একই দেবত্ব সমস্ত জীব ও জড় জগতে পরিব্যাপ্ত এবং তাই আমরা সকলে একে-অপরের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ। এই আত্মীয়তাকে উপলব্ধি করা, আত্মীয়তার পরিধি বাড়ানো এবং আত্মীয়তার ভাব নিয়ে অন্যের মঙ্গলের জন্য কাজ করাই হলো ধর্মের ভিত্তি। এই 'ধর্ম' 'রিলিজিয়ন' নয়। এই ধর্ম কাউকেই বর্জন করে না, বরং তা সকলকে অন্তর্ভুক্ত ও সংযুক্ত করে এবং সকলের পক্ষে কল্যাণকর।

জীবনের এই দর্শনই 'হিন্দু দর্শন' এবং ভারতের অধিবাসীরা তাদের জাত, প্রান্ত, সম্প্রদায় বা ভাষা নির্বিশেষে এই জীবন দর্শনের সঙ্গে একাত্ম। তাই 'হিন্দুত্ব' সকল ভারতবাসীর পরিচিতি এবং তা সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছে। আর এস এসের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার সকল ভারতীয়র মধ্যে ঐক্য ভাবনা জাগ্রত ও উদ্দীপ্ত করতে এই হিন্দুত্বকে ভিত্তি করেন এবং সমগ্র সমাজকে এই হিন্দুত্বের সূত্রে আবদ্ধ করে সংগঠিত করতে শুরু করেন।

কিন্তু যাঁরা ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক লাভের জন্য সমাজকে টুকরো টুকরো করতে চান, তাঁরা সঙ্ঘকে সাম্প্রদায়িক, পশ্চাদগামী, বিভেদকামী ও সংখ্যালঘু বিদ্বেষী বলে হিন্দুত্ব ও সঙ্ঘের বিরোধিতা শুরু করেছেন। হিন্দুত্বের পথিকৃৎ স্বামী বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ সরস্বতীর মতো অনেক মহান ব্যক্তিকে একই অভিযোগে কালিমা লিপ্ত করে তাঁদের সুমহান কীর্তির বিরোধিতা করা হয়েছে এবং তাঁদের ব্রাত্য করা হয়েছে।

কিন্তু হিন্দুত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সঙ্ঘের কার্যকলাপ এদের বিরোধিতা এবং না চাওয়া সত্ত্বেও বেড়েই চলেছে ও বিস্তৃত হচ্ছে। এখন এই অশুভ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সমালোচকরা বলা শুরু করেছেন যে, হিন্দুত্ব তো ঠিক আছে কিন্তু নরম হিন্দুত্ব ও গরম হিন্দুত্বের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের মতো পথিকৃৎদের হিন্দুত্ব নরম, কিন্তু সঙ্ঘ গরম হিন্দুত্বের অনুশীলন করে যা নিন্দনীয়। প্রথমে 'হোয়াই আই অ্যাম নট এ হিন্দু'-র মতো বই এবং তারপর 'হোয়াই আই অ্যাম এ হিন্দু' এই ধরনের বই নীতিবাগীশরা লিখেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও হিন্দুত্বের স্বীকৃতি ও বিস্তৃতি ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। কারণ তা ভারতের আত্মা, তাঁর অন্তরস্থ সন্দেশ।

আবার কায়েমি স্বার্থান্বেষীরা হিন্দুইজমকে ভালো কিন্তু হিন্দুত্বকে খারাপ বলে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো শুরু করেছেন। এক সংবাদমাধ্যম সম্প্রতি আমাকে জিজ্ঞাসা করে 'হিন্দুইজম' ও 'হিন্দুত্বের' মধ্যে পার্থক্য কী? আমি তাঁদের বলেছি যে, তা এক ও অভিন্ন। 'গোলাপ' এবং 'রোজ'-এ যতটুকু তফাত রয়েছে। একটি ইংরেজিতে ও অন্যটি হিন্দিতে। ড. রাধাকৃষ্ণন তাঁর 'হিন্দু ভিউ অব লাইফ' পুস্তকে ইংরেজিতে 'হিন্দুইজম' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু তিনি যদি হিন্দিতে বইটি লিখতেন, তাহলে 'হিন্দুত্ব' শব্দের ব্যবহার করতেন। যদি সাভারকর তাঁর বই 'হিন্দুত্ব' ইংরেজিতে লিখতেন তবে অবশ্যই 'হিন্দুইজম' শব্দ ব্যবহার করতেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে, হিন্দুত্বের সঠিক ইংরেজি অনুবাদ 'হিন্দুইজম না হয়ে 'হিন্দুনেস' হওয়া উচিত।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডাঃ মোহনরাও ভাগবতজী সম্প্রতি দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত

তিনদিনের বক্তৃতামালায় 'হিন্দু ও হিন্দুত্বের' বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু অপপ্রচারকারীরা সেটার উল্লেখ করেন না, কারণ তা তাঁদের অশুভ উদ্দেশ্যের সঙ্গে খাপ খায় না। প্রকৃত আদর্শগত লড়াই ভারতের দু'টি ভিন্ন ধারণার মধ্যে। একটি ভারতীয় ধারণা যা ভারতের যুগপ্রাচীন আধ্যাত্মিক পরম্পরার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং অন্যটি অ-ভারতীয় যার উৎস বহির্ভারত। সাংবাদিক থেকে রাজনীতিক হওয়া একজন নেতা সম্প্রতি বলেছেন যে, এই নির্বাচনে 'হিন্দু ইন্ডিয়া' ও 'হিন্দুত্ব ইন্ডিয়া'র মধ্যে একটিকে পছন্দ করতে হবে। তাঁর মতো লোকেদের হিন্দু ভারতের কথা বলার একমাত্র কারণ হলো হিন্দুত্বের ক্রমবর্ধমান প্রভাব। এটা তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয়কে প্রতিফলিত করে না, বরং এতে তাদের রাজনৈতিক ভাবে ভূমিকা বদল করতে সুবিধা হয়। ভারত 'হিন্দুত্বের' কারণে ঐক্যবদ্ধ হওয়ায় তাঁদের জাতপাতভিত্তিক, সাম্প্রদায়িক এবং আঞ্চলিক রাজনীতির ভিত্তি দিনদিন দুর্বল হচ্ছে এবং সমর্থন হ্রাস পাচ্ছে। তাঁদের সস্তা রাজনীতির জন্য সমাজের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা একান্ত প্রয়োজন। যদি জাতপাত, ভাষা, আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে নাও হয়, তবে হিন্দু এবং হিন্দুত্বের ভিত্তিতে সমাজকে ভাগ করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু বর্তমানে, সাধারণ ভারতীয়রা অতটা বোকা নন যে তাদের ফাঁদে পড়বেন। তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা এইভাবে প্রতিপ্রশ্নের সম্মুখীন।

বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য আরও একটি শব্দের ব্যবহার হচ্ছে সেটি হলো 'হিন্দুত্ববাদী' বা 'হিন্দুবাদী'। পুঁজিবাদী, সাম্যবাদী বা সমাজবাদী ধারণা বিশ্বে রয়েছে কিন্তু পাশ্চাত্যের মতো 'ইজম'-এর কোনও স্থান ভারতে নেই। এমনকী বলপূর্বক নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার এক হেজিমনিক বা আধিপত্যের প্রবণতা পাশ্চাত্যে 'ইজম'-এর ক্ষেত্রে দেখা যায়। ভারতে কেবল হিন্দুত্ব রয়েছে যা অধ্যাত্ম ভিত্তিক জীবনের একাত্ম ও সর্বাঙ্গীণ দৃষ্টিভঙ্গির আলোয় নিজেদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও পেশাগত জীবন অতিবাহিত করা যে সমাজ তাকে 'হিন্দু' বলে। তাই ভাগ ও বিভ্রান্ত করার এই চক্রান্তকে জনসমক্ষে প্রকাশ করা এবং হিন্দুত্বের শাশ্বত দর্শন ও জীবন মূল্যকে নিজেদের আচরণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। এর ফলে ভারতের যে পরিচয় বিশ্বে হাজার হাজার বছর ধরে রয়েছে, তা প্রকট হবে এবং সমাজ ও জাতীয় জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভারতের পুরুষার্থ প্রকাশিত হবে। 'স্বদেশ ও সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন যে, সর্বপ্রথম আমাদেরকে আমরা প্রকৃতপক্ষে যা, তা হতে হবে।

(লেখক : সহ সরকার্যবাহ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ)

হিন্দুত্বের বিশ্বব্যাপকতা

মানস কুমার সান্যাল

আজকাল অদূরদর্শী হিন্দুবিদ্বেষী অনেক ভারতীয় নেতা-নেত্রী ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীন শিক্ষা ও ঈশ্বরদৃষ্টি বর্জিত পাশ্চাত্যের সাম্যবাদের বাণী সমাজের সর্বস্তরে প্রচার করে দম্ভসহকারে বলেন, হিন্দুত্ব বা হিন্দুধর্ম হলো সাম্প্রদায়িকতা। সুতরাং নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেওয়া বা ভাবা সংকীর্ণতা। তার চেয়ে নিজেকে মানুষ ভাবাই উদারতা। হ্যা, একথা আমরা হিন্দুত্ববাদীরা মানি। নিজেকে হিন্দু মুসলমান,খ্রিস্ট্টান না ভেবে অথবা বৈষ্ণব-শৈব-শাক্ত-গাণপত্য-সৌর কিংবা বৌদ্ধ-জৈন-শিখ-অর্যসমাজী-ব্রাহ্মসমাজী-রামকৃষ্ণপন্থী এভাবে পরিচয় না দিয়ে নিজেকে 'মানুষ' ভাবাই উদারতার নিদর্শন। আবার নিজেকে মানুষ না ভেবে 'জীব' ভাবা তো আরও উদারতা। বাস্তবে নিজেকে ব্রহ্ম ভাবা বা জীরকুলকে সর্বব্যাপক ঈশ্বরের ওতপ্রোত অংশ ভাবা সর্বাপেক্ষা উদারতার নিদর্শন। হিন্দুশাস্ত্রে এই উদার দৃষ্টি বা 'সর্বাত্মভাব' বা 'সমদর্শন'-এর কথাই বলা হয়েছে। এই উদারতা বা সমদর্শন হিন্দুত্ব ভাবধারায় এক পূর্ণাঙ্গ জীবনপদ্ধতির মাধ্যমে ক্রমশ সাধনা দ্বারা লাভ হয়। তা অহংকার, ভেদদৃষ্টি, ভোগস্পৃহা, স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা লাভ করা যায় না।

হিন্দুরা পরমেশ্বরকে বা মহাজাগতিক শক্তিকে সর্বব্যাপীরূপে সর্বত্র দর্শন করেন পারমার্থিক দৃষ্টিতে। 'জলে বিষ্ণুঃ স্থলে বিষ্ণু বিষ্ণু পর্বত মস্তকে। জালামালাকুলে বিষ্ণুঃ সর্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ।।' হিন্দুরা শালগ্রামশিলা, রামশিলা, দেবমূর্তিতে সেই বিষ্ণুকে দেখেন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রে দেখে থাকেন। গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতী-নর্মদাতে দেখে থাকেন। অগ্নি, বায়ু ও আকাশে দেখেন। স্থূলজগৎ, সূক্ষ্মজগৎ ও কারণ জগতে দেখেন। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে দেখেন। বনস্পতি, অশ্বত্থ, বটবৃক্ষে দেখেন। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ও মূর্খেতে দেখেন। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টানে দেখেন। মন্দির-মসজিদ-গির্জায় দেখেন। পরিবারে ও সমাজে দেখেন। বিশ্বব্যাপী ও বিশ্বাতীত রূপে সর্বত্র বিরাজমান এক মহাজাগতিক সত্তা বা চৈতন্য শক্তির অনুভব করে তার পূজা করেন। কখনও একেশ্বরবাদী বা ব্রহ্মবাদী রূপে, কখনও সর্বেশ্বরবাদী রূপে, কখনও বহু ঈশ্বরবাদী রূপে, কখনও সাকার বা নিরাকার ব্রহ্মবাদী রূপে, কখনও সগুণ বা নির্গুণ রূপে নিজেকে পরিচয় দেন।

সমগ্র হিন্দু শাস্ত্রে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুরা সর্বব্যাপক ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বা শ্রীভগবানকে সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত দেখেন। এই উদার,বিশ্বব্যাপক সার্বভৌম ধর্মের নাম হিন্দুধর্ম। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন পদ্ধতি। এরই আর এক নাম মানবধর্ম। এই হিন্দুত্বকে বিকশিত করেছেন ভারতবর্ষের মুনিঋষিগণ। ■



‘হায় বাঙ্গালি একুশ নিয়ে গর্ব করো শিলচরেতে কি হয়েছিল বলতে পারো’

ড. রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন মনে রেখেছি। ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বীকৃতিও পেয়েছে। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য পূর্ব পাকিস্তানে যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন, তাঁদের অবশ্যই শ্রদ্ধা জানাই, প্রণাম জানাই। যদিও পূর্ব পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে যিনি প্রথম সরব হয়েছিলেন, তাঁর নাম ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর নাম অনেকেই ভুলে গেছেন। এই মানুষটি বাংলাভাষার সম্মান রক্ষার্থে পশ্চিম পাকিস্তানের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বাংলাভাষার জন্য সোচ্চার হয়েছিলেন। এই অপরাধে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁকে পাক সরকার জেলবন্দি করে এবং পুত্রসমেত তাঁকে হত্যা করে। ধীরেন্দ্রনাথকে যেমন বাঙ্গালি ভুলে গেছে, তেমনি ভুলে গেছে শিলচরে শহিদ হওয়া সেই এগারজন বাংলাভাষী মানুষের কথা যাঁরা মাতৃভাষার জন্য পুলিশের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিলেন ১৯৬১ সালের ঊনিশে মে।

১৯৬০ সালে অক্টোবরে অসমের বিধানসভায় তখনকার মুখ্যমন্ত্রী বি.পি. চালিহা একটি আইনের প্রস্তাব রাখেন। অক্টোবর মাসেই প্রস্তাবটি আইনের রূপ পায়। ওই আইনটির দ্বারা অসমীয় ভাষাকে অসম প্রদেশের একমাত্র সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অসমের বরাক ভ্যালির কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ এই তিনটি জেলার অধিকাংশ মানুষ তখনও বাংলাভাষী, আজও তাই। তা সত্ত্বেও অসম সরকার অসমীয় ভাষাকে একমাত্র প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৫৬ সালে যে States Reorganization Act পাশ করানো হয় পার্লামেন্টে, তাতে পরিষ্কার বলা আছে যে, যদি কোনও প্রদেশে শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ একটি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, তাহলেই শুধু ওই প্রদেশটি Single-lingual বা একভাষী প্রদেশ হিসেবে গণ্য হবে। অসমের পরিস্থিতি ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তা সত্ত্বেও অসম সরকার এটা করেছে দেশের আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে।

নিউটনের তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান এবং বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া হয়। স্বাভাবিক ভাবেই সরকারের ওই হঠকারী সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সমগ্র বাংলাভাষী বরাক ভ্যালিতে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এটা মেনে নিতে বাঙ্গালি রাজি ছিল না, তাই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তখন কাছাড় জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল তিনটি মহকুমা বা ব্লক, যথাক্রমে করিমগঞ্জ, শিলচর হাইলাকান্দি। করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি আশির দশকে ডিস্ট্রিক্টের মর্যাদা পেয়েছিল। এটা অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ।

‘কাছাড় গণসংগ্রাম পরিষদ’ ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গঠিত হয়। এই পরিষদ আন্দোলন শুরু করে সভাসমিতি, র‍্যালি, পদযাত্রা ইত্যাদির মাধ্যমে জনমত গঠনের কাজ পুরোদমে চালিয়ে যায়। এটা ছিল বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম, বাঙ্গালির ন্যায্য দাবির, ন্যায্য অধিকার রক্ষার সংগ্রাম। বাঙ্গালির এই আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক, শান্তিপ্রিয় এবং অবশ্যই নিরস্ত্র সংগ্রাম।

গণসংগ্রাম পরিষদের সর্বসম্মত নেতা ছিলেন রথীন্দ্রনাথ সেন। তিনি ঘোষণা করেন যে তাঁদের দাবি না মানলে ঊনিশে মে বারো ঘণ্টার একটি বন্‌ধ (তখন বলা হতো 'হরতাল') করা হবে। তাঁদের দাবি ন্যায়সঙ্গত শুধু নয়, আইনসঙ্গতও বটে। বাংলাভাষাকে যথার্থ স্বীকৃতি দিতে হবে, অসমীয় ভাষা থাকুক, সেই সঙ্গে বাংলা ভাষাকেও অন্যতম প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে গণ্য করতে হবে।

ঊনিশে মে পরিষদ যাতে কিছু করতে না পারে, তাই অসম সরকার আগের দিন থেকেই ব্যাপক ধরপাকড় চালাতে থাকে। জনে জনে জিজ্ঞাসাবাদ, বাঙ্গালিদের থানায় নিয়ে গিয়ে জেরায় জেরায় জেরবার করা। এক কথায় চরম অগণতান্ত্রিক কাজকর্ম সরকার শুরু করে দেয়। শুধুই বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেবে না বলে। গ্রেপ্তার হন পরিষদের নেতা রথীন্দ্রনাথ সেন, নলিনীকান্ত দাস এবং আরও নেতৃস্থানীয় কয়েকজন।

ঊনিশ তারিখ সকাল থেকেই সরকার যেন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে নেয়। সকাল সকাল দেখা গেল পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। শুধু পুলিশ? প্যারা-মিলিটারি ফোর্স নেমে গেল। রাস্তায় রাস্তায় টহল দিতে শুরু করল বরাক উপত্যকা জুড়ে। সমস্ত যান-চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। রেলের 'চাক্কা জ্যামের' পরিকল্পনা ছিল আন্দোলনকারীদের। সেই অনুযায়ী তারা সকাল সকাল শিলচর স্টেশনে গিয়ে সত্যাগ্রহ শুরু করে। ইঞ্জিনের সামনে তারা বসে পড়ে। রেল অবরোধ শুরু হয়ে যায়। আন্দোলনকারীদের ছিল জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য প্রতিজ্ঞা তারা নিজেদের প্রাণের কথা ভাবেনি। 'বাংলা ভাষাকে অসম্মানিত হতে দেব না', এই ছিল তাদের মনের কথা, প্রাণের কথা। পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস অবাধে চলল, কিন্তু আন্দোলনকারীদের দমানো গেল না। তারা ছিল বাংলাভাষার সহাসী-সৈনিক, অদম্য ছিল তাদের প্রাণশক্তি।

পুলিশ এরপর মরিয়া হয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগের রাস্তা নেয়। সম্ভবত জেনারেল ডায়ারের মতো ওই পুলিশদের নেতৃত্বে কেউ ছিল, তাই বিনা প্ররোচনায় কতগুলি নিরস্ত্র বাঙ্গালি আন্দোলনকারীর শরীর তাক্ করে গুলি চালাতে শুরু করে। রক্তে ভেসে যায় শিলচর রেলস্টেশন, রেলপথ। ওই বিবেকহীন, মনুষ্যত্বহীন সরকারের পদলেহনকারী পুলিশ সেদিন গুলি ছুঁড়তে দ্বিধা করেনি। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে লাগে আন্দোলনকারীদের শরীরে। ঘটনাস্থলেই নিহত হয় নয়জন। পরে আরও দুইজন। মোট এগারোজন শহিদ হয় বাংলাভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য। এই শহিদের মধ্যে একটি ছাত্রীও ছিল, যার বয়স ছিল ষোলো। নাম কমলা ভট্টচার্য। বাংলাভাষার জন্য ভারতের প্রথম মহিলা শহিদ কমলা। তার নাম আমরা কজন জানি? সেদিন আর যাঁরা শহিদ হন, তাদের নাম যথাক্রমে শচীন্দ্র পাল, বীরেন্দ্র সূত্রধর, সত্যেন্দ্র দেব, সুকমল পুরকায়স্থ, কানাইলাল নিয়োগী, হিতেশ বিশ্বাস, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, কুমুদ দাস, সুনীল সরকার ও তরণী দেবনাথ।

তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল নেহরু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন লালবাহাদুর শাস্ত্রী। বাঙ্গালি কোনওদিনই জওহরলাল নেহরুর কাছ থেকে যথোচিত মর্যাদা পায়নি। বাঙ্গালির আত্মবলিদানের স্বীকৃতি, বাঙ্গালির প্রতিভার স্বীকৃতি, বাঙ্গালির ন্যায্য দাবির স্বীকৃতি— নৈব নৈব চ।

পরে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর উদ্যোগে বরাক ভ্যালিতে স্কুল-কলেজের সিলেবাসে ও প্রাদেশিক সরকারের কাজেকর্মে বাংলাভাষা মর্যাদা প্রাপ্ত হয়।

অবিস্মরণীয় সঙ্গীতশিল্পী প্রয়াত কালিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন— ''ঊনিশে মে আমার কাছে আত্মপরিচয়ের আর এক নাম। শুনেছি ওই ঘটনার পরদিন বহু জায়গায় অরন্ধন পালিত হয়— আমি চাই প্রচারমাধ্যম ও দলমত নির্বিশেষে সকলে এই দিনটির ব্যাপারে সচেতনতা বাড়াতে এগিয়ে আসুন।''

বাঙ্গালি আত্মবিস্মৃত জাতি। কিন্তু এই ঐতিহাসিক মর্মান্তিক ঘটনার কথা যদি আমরা ভুলে যাই, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

এ প্রসঙ্গে কবিতার উল্লেখ সেদিনের পরিস্থিতিকে বুঝতে সাহায্য করবে :

''কম্‌লি মা রে, চললি কোথায় শুনলি কথা?
ফিরতে যদি হয়রে দেরি ভাত খেয়ে যা।
'মা রে আমার যাচ্ছি আমি ভাষার ডাকে,
বাংলা ভাষা মরছে মা গো আইনি চাপে।'
'ভাতটা গরম রাখিস আমার বসবো খেতে,
আন্দোলনে অংশ নেবো সবার সাথে।'
ফিরলো মেয়ে মালায় ঢাকা শরীর নিয়ে,
মে মাসেরই ঊনিশ তারিখ বুলেট খেয়ে।
পুলিশ ছিল মারবে বলে ফোর্সটা নিয়ে,
কমলি গেল বাঙ্গলা মাকে সেলাম দিয়ে।
হায় বাঙ্গালি একুশ নিয়ে গর্ব করো,
শিলচরেতে কি হয়েছিল বলতে পারো?''

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

কমিউনিস্টরা শুধু ধর্ম-বিরোধী নয়, প্রচণ্ড হিন্দু-বিদ্বেষী

ডাঃ আর দাস

'চেয়ারম্যান মাও, আমাদের চেয়ারম্যান', 'ধর্ম হচ্ছে জনগণের আফিম', 'পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি হচ্ছে শূয়োরের খোঁয়াড়, বেশ্যাবৃত্তি' ইত্যাদি স্লোগানের সঙ্গে আমরা পরিচিত সেই ৭০-৮০-র দশক থেকেই। বলুন তো তথাকথিত কমিউনিস্টরা ধর্ম-বিরোধী না কেবল হিন্দু-বিদ্বেষী? দুর্গাপূজার প্যান্ডালের সামনে মার্কসীয় সাহিত্যের স্টল লাগে কিন্তু মুসলমানদের পরবের সময় তো মার্কসবাদ প্রচার করা হয় না। কতকগুলো উদাহরণ দিচ্ছি। পঞ্জাবের কম: হরকিসেন সিংহ সুরজিতের হাতে বালা, মাথায় বাগড়ি, ইয়া লম্বা দাড়ি। সারাজীবন উনি শিখধর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। নামটাও দেখুন, হর=শিব আর কিসেন=শ্রীকৃষ্ণের কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণা ছিল চরম! সিপিআই নেতা কমঃ ইন্দ্রজিত গুপ্ত সারাজীবন বামপন্থার গীত গেয়েছেন। আর পড়ন্ত বেলায় ৬২ বছর বয়সে, ইসলামধর্ম কবুল করে, ইফতিকার আলি নাম নিয়ে, নিকা করেন আহমদ আলির তালাকপ্রাপ্তা সুরাইয়াকে। আবদুর রেজ্জাক মোল্লা, সারাজীবন সরকারি সুবিধা ভোগ করলেন বাম-জামানায় বামপন্থী নেতা ও মন্ত্রী হয়ে। তারপর সুযোগ বুঝে, ২০১১ সালে হয়ে গেলেন তৃণমূলি নেতা ও মন্ত্রী কেননা কমিউনিস্টদের মতো মমতারও চাই মসলমান ভোট। এই ধর্মপ্রাণ মুসলমান নেতা শোয়াব বা পুণ্য অর্জনের জন্য একাধিকবার হজ করেছেন কাফেরের রক্তজল করা পয়সায়। বামপন্থী নেতা সিপিএমের পলিটব্যুরোর সদস্য, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন স্পিকার প্রয়াত হাসিম আব্দুল হালিমের দ্বিচারিতা লক্ষ্য করেছেন কী? তিনি কুম্ভকর্ণের মতোই খেতেন আর ঘুমাতেন। শরীরের অস্বাভাবিক ওজনের জন্য নানা ব্যাধিতে ভুগতেন আর মারাও যান সেই কারণে। তিনি খুবই নিষ্ঠাবান মুসলমান



ছিলেন। মুখে ছিল হিন্দুধর্ম বিরোধী মার্কসীয় তত্ত্ব কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে তিনি নিজে কাফেরের টাকায় হজ করেছেন নির্দ্বিধায়। অন্যদিকে উত্তর কলকাতার সিপিএম নেতা তথা ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী যখন তারাপীঠে পূজা দিতে গেছিলেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে 'শোকজ-নোটিশ' পাঠিয়েছিলেন, বামপন্থী নেতা সীতারাম ইয়েচুরি আর প্রকাশ কারাতারা। এদের দুজনেরই উৎপত্তি কিন্তু হিন্দু পরিবারে। তারা কিন্তু ইসলাম বা খ্রিস্টান-ধর্ম বিরোধী নন! মনুসংহিতা পোড়ানোয় বিশেষ পারদর্শী। প্রকাশ্যে বাছুরকে মেরে, গোমাংস খেয়ে ও বিলিয়ে নিজেদের সেকুলারতত্ত্ব প্রমাণ করেছেন কিন্তু কখনও কি কোনো বামনেতার হিম্মত হয়েছে, কোরান বা হাদিসকে পোড়ানোর বা শুয়োরের মাংস মুসলমান বামনেতাদের খাওয়ানোর? আসলে ভীরু, কাপুরুষ, স্বার্থপর, লোভী আর বামপন্থী এইসব বানেতারা হচ্ছেন বহুরূপী! লক্ষ্য করেছেন, প্রতিটি মসজিদের আশেপাশেই আছে তাদের পার্টি অফিসগুলি। কীসের ভয়ে? তাঁরা মার্কসের 'দাস ক্যাপিটাল', লেনিন বা মাওবাদ পড়েছেন কিন্তু গীতার মাত্র ৭০০ শ্লোক পড়েননি। হলপ করে বলতে পারি, হিন্দুনামধারী বামনেতারা কোনোদিন কোরান পড়েননি। যদি পড়তেন আর যদি সৎ-সাহস থাকতো তবে কখনই এতটা হিন্দু-বিরোধী হতে পারতেন না। যে থালাতে ভাত খাচ্ছেন তাকেই ফুটো করছেন! কীরকম মানুষ আপনারা? সীতারাম ইয়েচুরির ইংরেজি প্রবন্ধগুলি পড়লে বুঝতে পারবেন, কীরকম ভয়ংকর আর তীব্র তার হিন্দু-বিদ্বেষ। মোদী বারবার মৃত্যুর আশঙ্কা প্রকাশ করেন। জানেন, কারা সেই জঘন্য ষড়যন্ত্রের পুরোহিত?

হিন্দুনামধারী বামনেতাদের সর্বদায় হিন্দুধর্ম-বিরোধী হতেই হয়। আর এস এস, বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বিজেপির কট্টর সমালোচনা করা, রামায়ণ ও মহাভারতের বিরুদ্ধে বিষ-উদ্গার করা তাদের দৈনন্দিন কার্যের তালিকায় থাকে কিন্তু কোনো মুসলমান নামধারী তথাকথিত বামনেতা ইসলামের, 'শরিয়তি আইন, কোরান বা হাদিশের' সমালোচনা করার সাহস দেখিয়েছেন কি? বামনেতা কমঃ মোহম্মদ সেলিমকে (যার স্ত্রী একজন হিন্দু-ডাক্তার) কেউ দেখেছেন শুয়োরের মাংস খেতে? কিন্তু কমঃ বিমান বসু আর বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যকে সাচ্চা কমিউনিস্ট প্রমাণ করার জন্য প্রকাশ্যে গোমাংস খেতে হয়! এরই নাম প্রগতিশীলতা আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। সন্ত্রাসবাদী 'লাদেনকে' এনারা 'কমরেড' বলে সম্বোধন করেন। সুপ্রিমকোর্টের বিচারক, 'আফজল গুরুর' ফাঁসির সাজা শুনালে, এরা প্রতিজ্ঞা করেন,

'তেরা কাতিল জিন্দা হ্যায়, হম সব শর্মিন্দা হ্যায়'! এরা বর্মা থেকে বিতাড়িত হিন্দু-বৌদ্ধদের খুনি, ধর্ষক ও সন্ত্রাসবাদী রোহিঙ্গা মুসলমানদের ভারতে পুনর্বাসনের আপ্রাণ চেষ্টা করেন! এরা সিরিয়ায়, ইয়েমেনে, সুদানে এমনকী নিউজিল্যান্ডের ঘটনায় ঘড়া ঘড়া অশ্রুবর্ষণ করেন কিন্তু পাশের দেশ পাকিস্তান আর বাংলাদেশে যে প্রতিদিন পাইকারি হারে নিঃস্ব, অসহায় হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার, খুন, ধর্ষণ আর ধর্মান্তকরণ ঘটে চলেছে, শুনেছেন তার বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদ করতে কোনো বামনেতাদের?

আচ্ছা বামনেতারা কি জানেন না, ইসলামিক রাষ্ট্রে বামপন্থার কোনো স্থান নেই? ভারত ইসলামিক রাষ্ট্র হলে তারাও তো মরবেন!ঋ তানা হলে ধর্মান্তরিত হয়ে পাকিস্তানের 'মুজাহির' আর বাংলাদেশে 'মালাউন থেকে মুশরিক হবেন'! কামবাসনা পূর্ণ করার জন্য আইনত ৪টি বিবি অবশ্যই পাবেন আর রসনা তৃপ্তির জন্য গোমাংস!

যারা আরব থেকে তরবারি হাতে আক্রমণকারীর বেশে এল, আজ তারা হলো ইন্ডিয়ান আর মুলনিবাসী ভারতবাসী তারা হলো কাফের। মুসলমানরা ঋষি কশ্যপের দেশে হলো কাশ্মীরি আর হিন্দুপণ্ডিতরা হলো রিফিউজি! এটা আমার বা আপনার না, বামনেতাদের পরিভাষা। তাদেরকে রিফিউজি কেন হতে হলো? কারণ তারা নাকি মুসলমানদের আর্থিক অনটনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেমনটি হয়েছিল অসমের 'বাঙ্গালি হিন্দুদের' উচ্ছেদের কারণ। এবার পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি হিন্দুদের কি হবে, ভেবেছেন সেকথা? কাশ্মীরি সন্ত্রাসবাদী ও নারীদর্ষক 'বুরহান ওয়ানি' এদের ভাষায়, 'গরিব স্কুলমাস্টারের মেধাবী ছাত্র'। মিথ্যা মামলায় জড়ানো সাধ্বী প্রজ্ঞা সিংহ ঠাকুর ভূপালে বিজেপির টিকিটে কংগ্রেসের দিগ্বিজয় সিংহের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন বলে সমালোচনার ঝড় উঠেছে কিন্তু 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' কেসে জামিনপ্রাপ্ত রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে সেই একই ব্যক্তি নিশ্চুপ রয়েছেন। এতেই প্রমাণিত হয় বামপন্থীর দ্বিচারিতা। সিপিএমের আমলে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ছিল বাঙ্গলায় বামেদের ৩৪ বছর টিকে থাকার মূল রহস্যটি। স্বাধীনতার পরে নেহরুর অদূরদর্শিতা আর ব্যর্থতার কারণে দ্বিখণ্ডিত ভারতে হিন্দুদের আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, ধার্মিক এবং শিক্ষার অধঃপতন ঘটে কেবলমাত্র মার্কস আর স্টালিনপন্থী চিন্তাবিদদের ভুলে ভরা নীতির জন্য। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা আর কেরলে তথাকথিত সংখ্যালঘুদের সাহায্যে দশকের পর দশক অসহায় হিন্দুদের উপর নিদারুণ শোষণ আর শাসন চালিয়ে গেছে বামনেতারা। শংকরাচার্যের দেশ, 'ভগবানের নিজের দেশ', কেরলে হিন্দুর সংখ্যা ৪৫%, মুসলমান ২৭% আর খ্রিস্টান ১৯%। কেরলে বিজেপি জিততে পারবে? পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত সীমান্তবর্তী শহরগুলিতে (১১/১৮) হিন্দুরা সংখ্যালঘু। মুসলমান গুণ্ডারা হিন্দুদের ভোট দিতে দিচ্ছে না। শাসকদলের মুসলমান তোষণ নীতির জন্য পুলিশ দলদাসে পরিণত হয়েছে। হিন্দুরা কম দামে মুসলমানদের কাছে নিজের সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। লেখক নিজে, মুর্শিদাবাদে পিতৃপুরুষের ভিটা জমিজমা বিক্রি করে কলকাতায় 'পায়রার খাঁচার মতো ফ্ল্যাটে' আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এখন ২০১৯ সালের লোকসভার নির্বাচন ঘিরে চরম উত্তেজনা! বামপন্থীরা ৪২টা সিটেই প্রার্থী দিয়েছে। রায়গঞ্জে দাঁড়িয়েছেন সিপিএমের সেলিম। বামনেতা বা তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থাকা মুললমান গুন্ডারা, রায়গঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে হিন্দুদের ভোট দিতে দিচ্ছে না? ভবিষ্যতের কটা বছরে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর আর কোনো অস্তিত্বই থাকবে না! ইসলাম আর বামপন্থা যে মুদ্রার এপিঠওপিঠ। ডাঃ বিল ওয়ার্নারের পরিসংখ্যানে হিটলার ২০, মাও ৫০ আর স্টালিন ৬০ মিলিয়ন নিজের দেশবাসীকেই খুন করেছিলেন। এরা স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দখল করেছে। এদের লোক সর্বত্র। পাঠককে অনুরোধ করবো, বিবেক অগ্নিহোত্রীর, 'বুদ্ধ ইন ট্র্যাফিক জ্যাম' সিনেমাটি দেখতে। তারা সেখানে জেহাদিতত্ত্বকে প্রকাশ্যে সমর্থন ও সাহায্য করছে।

ইউরোপ আর আমেরিকা আজ অত্মসমর্পণের পথে। গত সপ্তাহেই আমেরিকা ভারতকে ন্যাটোর সদস্য করেছে, এই ভেবে যে ভবিষ্যতের 'ইসলাম আর পশ্চিমি সভ্যতা'র যুদ্ধে ভারতকে সঙ্গী হিসেবে পেলে সাদা চামড়ার বহু খ্রিস্টান সৈনিক অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। এমনিতেই তাদের জন্মহার ১% এরও কম। ইউরোপে এখন চার্চে আর লোক যায় না। 'পাব কালচার, মিউজিক কন্সার্ট আর সকারের' নেশাতেই মত্ত সারা ইউরোপ। অন্যদিকে অতি সন্তর্পণে বামপন্থী 'লেফট লিবেরালদের' যাহায্য নিয়ে, মুসলমানরা সারাবিশ্ব থেকে এসে জড় হচ্ছে ইউরোপ, আমেরিকা আর ভারতে কেননা কোরানে লেখা আছে দার-উল-হারাবকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করতেই হবে।

এগুলি তো গেল বিদেশের কথা। আসলে লেখক বিদেশে বহুদিন বসবাস করার জন্য সেদেশের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করে, ভারতের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করছে আর কি! আচ্ছা সত্যি করে বলুন তো, আপনারা কখনও শুনেছেন কি কোনো হিন্দু বা মুসলমান নামধারী বামনেতাকে 'তালিবান, আলকায়দা, বোকো হারাম বা জয়েশ-ই-মহম্মদের' বিরুদ্ধে সমালোচনা করা তো দূরঅস্ত, নামোচ্চারণ মাত্র করেছেন? কানহাইয়া কুমার, অনির্বান ভট্টাচার্য্য, সহেলা রসিদ, ওমর খালেদের মতো বাম ছাত্রনেতারা প্রকাশ্যে হিন্দুদের অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে, হিন্দুদেবদেবীদের অপমান করছে কিন্তু আমরা হিন্দুরা তথাকথিত শান্তির দোহায় দিয়ে সহ্য করে যেতে বাধ্য হচ্ছি। সীমান্তে গোরুপাচার, হিন্দু মেয়েদের অপহরণ, হিন্দু মন্দির লুণ্ঠন অবাধে হচ্ছে কিন্তু আমরা জেনেশুনেও অসহায় হয়ে চুপ করে বসে আছি। নিজেদের অস্তিত্বের লড়াইয়ে একত্র হয়ে বামপন্থার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। ভারতের সুরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অজিত দোভালের কথায়, 'আমাদের সব থেকে বড়ো শত্রু কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীরা নয়, তার থেকেও বড়ো শত্রু হচ্ছে বামপন্থীরা অর্থাৎ মাওবাদী বা নকশালরা। '৯৯ সালের 'কার্গিল যুদ্ধে' ৫৮৭ জন্য জওয়ানের মৃত্যু হয়েছিল কিন্তু জানেন কি প্রতিবছর মাওবাদীদের হামলায় নিরীহ নাগরিক আর জওয়ানদের মৃত্যু গড়ে ১০০০ হাজারের বেশি? শুনুন, আপনারই পাশে বসে থাকা লোকটি বামপন্থী, আপনারই ছদ্মবেশী ঘাতক? তারা ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি নামধারী কিন্তু তীব্র হিন্দু-বিদ্বেষী অথচ অত্যাচারী মুসলমানের প্রাণেরও আপন। সুতরাং শত্রুকে প্রথমে চিনতে হবে, তবেই না লড়াই হবে!

জয় হিন্দ! বন্দে মাতরম!!

বাংলাদেশের হিন্দুদের জন্য একটু সমবেদনা জানান

গত ৪ মে বাংলাদেশে হিন্দু মহাজোট নেতা পলাশকে জেলে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর চরম অত্যাচার ও নির্মম হত্যার করুণ কাহিনির পুনরাবৃত্তি মাত্র। পলাশ রায় পেশায় একজন দক্ষ উকিল। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশের বেশ কিছু ঘটনা বিভিন্ন বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার, ধর্ষণ, নিপীড়ন, ধর্মান্তরণ, সম্পত্তি দখল, দেশ ছেড়ে চলে যাবার হুমকি অহরহ চলছে। এরকম খবর সরকারি ভাবে বাংলাদেশের বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। বৈদ্যুতিন মাধ্যমেও উঠে আসে না। এখন ফেসবুকে, ভারতের বাংলা ও ইংরেজি দৈনিকের দৌলতে বাংলাদেশের নানান খবরের পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের উপর পৈশাচিক আক্রমণের খবর এদেশে পৌঁছে যাচ্ছে। বাংলাদেশে মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনগুলির অপরাধমূলক কার্যকলাপ দমনের প্রচেষ্টা কোনো কালে সেই দেশের সরকারের ছিল না। এরশাদ থেকে খালেদা জিয়া সরকারের সময়ে গজিয়ে ওঠা এই জঙ্গি সংগঠনগুলিকে গোড়াতেই নির্মূল করার চেষ্টা করা হয়নি। সরকারের উদাসীনতারও গাফিলতির সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশে এদের প্রভাব বেড়েছে আর প্রতিবেশী দেশ ভারত-নেপাল-ভুটানে এরা প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রাতের অন্ধকারে কাঁটাতারের বেড়া টপকে পশ্চিমবঙ্গ অসম, মেঘালয়, ত্রিপুরায় এরা ছড়িয়ে পড়ছে। এরা খুবই সহজে জাতভাইদের কাছে আস্তানা খুঁজে নিচ্ছে।

বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে জঙ্গি কার্যকলাপ ভীষণ ভাবে মাথা চাড়া দিয়েছে। বছর কয়েক আগে ঢাকার বড়ো বড়ো পাঁচতারা হোটেল, শপিংমল, রেস্তোঁরায় বোমা বিস্ফোরণ করেছে। তাতে বহু সাধারণ ও নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এই জঙ্গিরা বেছে বেছে হিন্দু মন্দির ধ্বংস, মন্দিরের পুরোহিত নিধন, প্রতিমা গুঁড়িয়ে দেওয়া, মঠ-মন্দির দখলের চেষ্টা— এগুলি অনবরত চালিয়ে যাচ্ছে। এই খবরগুলি বাংলাদেশ সরকার ধামাচাপা দিতে যাচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের হিন্দু বিচারপতি সুরেন্দ্রনাথ সিনহাকে প্রাণনাশের হুমকি, শেষে নজরবন্দি এবং দেশ ছাড়া করার সুকৌশল পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে জঙ্গিদের। এরকম ভাবে এই মৌলবাদী সংগঠনগুলি পশ্চিমবঙ্গেও অঙ্গুলি হেলনে ওই দেশের সরকার। সমান্তরাল ভাবে নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে আমরা শেখ হাসিনা ও মমতা সরকারের সদর্থক ভূমিকা দেখছি না। তারা সরকারি সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশে হিন্দুরা শান্তিতে আছেন। কিন্তু কোথায় শান্তি? এতই যখন শান্তিতে আছেন হিন্দুরা তাহলে তাঁরা নিজেদের রক্ষার জন্য বাংলাদেশে হিন্দু মহাজোট গঠন করলেন কেন? কাদের পৈশাচিক আক্রমণের ভয়ে এই মহাজোট তৈরি করতে বাধ্য হয়েছেন হিন্দুরা? কেন হিন্দু মহাজোটের নেতা পলাশ রায়কে জেলে পুড়িয়ে হত্যা করা হলো?

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের নিরাপত্তা, সরকারি সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে কোনওরকম কমতি রাখেননি। তিনি প্রথম ও একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী যিনি মুসলমান তোষণের জন্য শিরোপা পেয়েছেন। এই রাজ্যে কন্যাশ্রী ও যুবশ্রীর আওতায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় মুসলমানরা লাভ পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর বিনামূল্যে আবাস যোজনায় ঘর, বিনামূল্যে শৌচালয় প্রকল্প, বিনামূল্যে উজ্জ্বলা যোজনার গ্যাস, জনধন যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত প্রভৃতি সার্বিক ভাবে ভারতের সমস্ত গরিবদের জন্য হলেও এরাজ্যে বেশি উপকৃত হয়েছে এ রাজ্যের মুসলমানরা। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠুন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ওদেশের হিন্দুদের জন্য একটু সমবেদনা জানান। এখনকার বুদ্ধিজীবীরা একটা মোমবাতি মিছিল করুন।

—রাজু সরখেল,
দিনহাটা, কোচবিহার।

চিঠিপত্র

যারা দেশের ভালো চায় তাদের পাশে থাকতে হবে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটা কথা মনে পড়েছে আজ। কথাটি হলো 'আজ যেখানে যাবার জন্য এত কান্না করিতেছ একদিন সেখানে না যাবার জন্য এর চেয়ে বেশি কান্না করিতে হইবে।' অবশ্য এখানে কান্নাটি কোনো নেতা-নেত্রীর নয়। ১৩০ কোটির মধ্যে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনসাধারণের। আমাদের দেশের নেতা-নেত্রীরা নিজের নাক নয় জনগণের নাক কেটে একজনের দেশের হিতকারী যাত্রা ভঙ্গ করার জন্য অনবরত চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাই কবির ভাষা একটু বদল করে বলতে হয় ''এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, যেখানে নেতা-নেত্রী দেশের সর্বনাশের জন্য বিকায় ভূমি''। আজ এই লগ্নে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে এরা অনেকেই রাজা হতে চায়, আবার চায়ও না। কারণ তাদের উদ্দেশ্যই অন্যের খাবার নষ্ট করা। আমিও খাবো না তোমার খাবার কেড়ে নিয়ে আস্তাকুড়ে ফেলব। এমন দেশও আছে সেটা এই ভারতবর্ষ। এই দেশেরই স্বনামধন্য নেতা-নেত্রীরা চায় নরেন্দ্র মোদীর খাবার নষ্ট করতে। তাতে যে নরেন্দ্র মোদীর কিছুই যায় আসে না সে সম্বন্ধে তাদের সম্যক ধারণাও নেই। কারণ প্রধানমন্ত্রীর কিছুই হবে না। হবে দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সর্বনাশ। কারণ শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ চায় দেশের ভালো হোক। কিছু লোক চায় নিজেদের পিঠ বাঁচাতে। তাই তারা ভোট দেয় এই সব নির্বোধ নেতা-নেত্রীদের। তাতে দেশ গোল্লায় গেলেও তাদের কিছু যায় আসে না। ঈশ্বর কবে এদের সুমতি দেবে! ভোট বাক্সের মাধ্যমে দেশের উন্নতিতে অংশ গ্রহণ করতে

কবে শিখবে। যারা দেশের ভালো চায় তাদের পাশে থাকতে কবে শিখবে।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর।

ভদ্রলোক গায়ে লেখা থাকে না

বর্তমানে যেভাবে রাজ্যের নেত্রী দেশের প্রধানমন্ত্রীকে চাওয়ালা, চৌকিদার, হরিদাস বলে সম্বোধন করে চলেছেন তাতে করে পশ্চিমবঙ্গবাসী হয়েও বলতে লজ্জা নেই যে এটা কোনো ভদ্রলোকের ভাষা নয়। দুর্নীতি করতে করতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে অসভ্যরাই এরূপ বলেই থাকেন।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেছেন, যে মিথ্যাকথা বলার জন্য যদি কোনো পুরস্কার দেওয়া যায় তাহলে মোদীকে দেওয়া উচিত। তাহলে বলতে বাধা নেই কটূভাষী, অসভ্য বক্তব্যে পারদর্শিতার জন্য নেত্রীকে যদি সর্বোচ্চ পুরস্কার 'নোবেল' দেওয়া হয় তাহলে আর যাইহোক সত্যের অপলাপ হবে না। নেত্রী যদি বলেন উনি 'মিথ্যাকথা বলেন না' তাহলে সেটাই হবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মিথ্যাকথা।

নেত্রী এবার নির্বাচনের জন্য যথেষ্ট অসভ্যতার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চরিত্র হননের পথে নেমেছেন। তাহলে সত্যি কথা বলতে কি দেশের প্রধানমন্ত্রী যদি তদন্তে নামেন যে কীভাবে ওই বিশাল জায়গা দখল করেছেন শচীন ঘোষের কাছ থেকে। অবশ্য এসবকথা প্রধানমন্ত্রী জানবেন কী করে! দীপক কুমার ঘোষের (আইএএস) বইটি যে বাংলায় লেখা। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী এসব কথা জানলেও তিনি কোথাও নির্বাচনী সভায় বা অন্য কোনো কারণে বলতেন না, কারণ ভদ্রলোকেরা ভদ্র ভাবেই কথা বলতে ভালোবাসেন।

কীভাবে নেত্রীর বাবা ও নেত্রী নিজে সপরিবারে ওই প্রকার বিশাল জায়গা বাড়ি সমেত রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে দখল করেছেন সেকথা দীপকবাবু সবিস্তারে তাঁর পুস্তকে লিখে রেখে গেছেন।

প্রতিবেদনটির যথার্থতা প্রমাণ করার কারও ইচ্ছা জাগলে দীপকবাবুর বইখানি পড়ার অনুরোধ জানাই। এই নির্বাচনের উদ্যোক্তা সুকুমার সেন কী জানতেন ১৯৫২ সালে নির্বাচনের ব্যবস্থা করার পর এইভাবে জ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের অসভ্যতা হবে? শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করবে?

যেভাবে এবার নির্বাচনের স্বার্থে নেত্রী শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করে সব জায়গায় বক্তব্য রেখে যাচ্ছেন তাতে করে যদি জনগণও তাঁর উদ্দেশ্যে শালীনতা বহির্ভূতভাবে বলে থাকে তাহলে তো তাদেরও অন্যায় হবে না নিশ্চয়।

অন্যান্য রাজ্যেও তো ভোট হচ্ছে। সেইসব রাজ্যের নেতা- নেত্রীরা তো দেশের সর্বাধিনায়কের উদ্দেশ্যে এইরূপ অশালীন মন্তব্য করছেন না? কী জানি বাপু রাজ্যের জনগণের আদার ব্যাপারির জাহাজের খবরের কী দরকার। তবে একটা প্রবাদ বলা যায় 'কাঠ খেলে আংরা মল ত্যাগ' যে করবে সেকথা বলাই বাহুল্য।

—দেবপ্রসাদ সরকার,
মেমারী।

চাঁদ কাজি ও হরিনাম

আজ বাঙ্গলার আকাশে চাঁদ কাজিদের প্রার্দুভাব বাড়ছে। বাড়ছে তাদের ক্ষমতা ও দাপট। বাঙ্গলায় আজ মহাপ্রভু বা যবন হরিদাস না থাকায়, চাঁদ কাজির কেষ্টবিষ্টুদের দাপটে হিন্দুরা তাদের ইষ্টনাম প্রকাশ্যে মনের আনন্দে বলতে পারছে না। শ্যামাপ্রসাদের বাঙ্গলার আজ মহাদুর্দিন। তবে যোগেন মণ্ডল-জিন্না সাহেবদের এই বাঙ্গলার আজ পোয়া বারো।

বর্তমান শাসকদল ভোটের লোভে রামনবমী পালন করে হিন্দুদের বোকা বানায়। তাই তাদের দলের নেত্রীর সামনে কয়েকজন ধর্মপ্রাণ হিন্দুর রামনামের শব্দে তিনি শুধু অপমানিত নয় মূর্ছিত হয়ে যান। রামনাম বন্ধের আদেশ না দিলেও এই নিষিদ্ধ ধ্বনি বলার জন্য বা তাকে শুনানোর জন্য কয়েদ করার ফরমান দেন। পশ্চিমবঙ্গ তাই ধীরে ধীরে পূর্ববঙ্গের পথে যাচ্ছে, যেখানে প্রায় ২৯ শতাংশ হিন্দু আজ ৮ শতাংশে এসেছে। এদেরই দৌলতে, বাঙ্গলায় আজ আর রামনাম না করে রহিম নামই সরকার প্রোষিত ধ্বনি বলে প্রকারন্তরে স্বীকৃতি পাচ্ছে। বাঙ্গলার আজ সত্যিই কপাল পুড়েছে।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর, পূর্বমেদিনীপুর।

ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। অন্ন ভিক্ষার হতে পারে অথবা নিজের অর্জন করা হতে পারে। অন্ন অর্জন করা না ভিক্ষার কোনটা বেশি সম্মানের? অর্জন করা অন্ন যদি সম্মানের হয় তার জন্য কাজ করতে হবে। তার জন্য রাষ্ট্রকে কাজ করার পরিসর তৈরি করে দিতে হবে। রাষ্ট্র যদি কাজ করার পরিসর তৈরি করে তাহলে সে তার প্রয়োজনীয় অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে। যেটা একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের একটা আশু কর্তব্য। সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে এমন অনেক রাজ্য আছে যাদের কাজের পরিসর তৈরি করার ক্ষমতা অনেক বেশি। সেখানে কাজ করার পরিসর অনেক বেশি।

দেশে যেহেতু জনসংখ্যার একটা বিস্ফোরণ হয়েছে। তা সত্ত্বেও সেখানে মানুষের একটা কাজের সুযোগ রয়েছে। সেখান থেকে সে অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করতে পারে। যদি সে কাজ করে অন্নের সংস্থান করতে পারে তাহলে সে গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো কিছুটা হলেও সে অর্জন করতে পারবে। যদি রাষ্ট্র বিশেষ ধর্মের মানুষকে কোনও ভাতা পাইয়ে দেবার নাম করে সেই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি শুরু করে, তখন সেই মানুষগুলো স্বাভাবিকভাবেই সেই রাজনৈতিক দলের দাস হয়ে পড়ে। এতে সাময়িক ফল পাওয়া যেতে পারে কিন্তু এতে সুদূর প্রসারি ফল এতে পাওয়া যায় না। তারা সুবিধাভোগী হয়েই থাকে।

—সুমন সরকার,
ধুলাগড়ী, হাওড়া।

শাড়ির গৌরবময় পরম্পরা বাঙ্গালি মহিলাদেরই বহন করে নিয়ে যেতে হবে

সুতপা বসাক ভড়

ভারতীয় মহিলারা যতই আধুনিক হই না কেন, শাড়িকে একটি বিশেষ পারম্পরিক পোশাক হিসাবে সবসময় প্রাধান্য দিয়ে থাকি। শাড়ির চলন কোনোদিন পুরানো হয় না। বিয়ে, অন্নপ্রাশন, পূজা-পার্বণ ইত্যাদিতে আমরা শাড়ি পরতেই পছন্দ করি। ভারতীয় সংস্কৃতি এবং হিন্দু পরম্পরাতে খ্রিস্টপূর্ব ২৮০০ সাল থেকে শাড়ির অস্তিত্ব জানা যায়। যজুর্বেদে সর্বপ্রথম শাড়ির বর্ণনা পাওয়া যায় এবং ঋক্‌বেদে জারদৌসী শাড়ির উল্লেখ আছে। ওই সময় দেব-দেবীদের সাজানোর জন্য মুখ্যত শাড়ির ব্যবহার করা হতো। মহাভারতে দুর্যোধন যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের চেষ্টা করে তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং দ্রৌপদীর শাড়ির দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে তাঁর সম্মান রক্ষা করেন। সেই সময় থেকে স্ত্রীর সম্মান এবং রক্ষার প্রতীক হিসেবে শাড়ির গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

অতীতে নারী-পুরুষ উভয়েই শাড়ি পরত। তবে শাড়ি তখন শরীরে পেঁচিয়ে নেওয়া হতো। পরে মহিলারা শরীরের ঊর্ধ্বাংশের জন্য ওড়নার মতো কাপড় ব্যবহার করত এবং নীচে ঘাগরার মতো পোশাক পরিধানের চল ছিল। পরে, সময়ের সঙ্গে দু'টুকরো শাড়ি জুড়ে এক হয়ে যায়। তখন থেকেই শাড়ি আধুনিক রূপ ধারণ করে। এইভাবে শাড়ির অংশবিশেষের প্রতীকাত্মক ব্যবহার শুরু হয়। যেমন, শাড়ির ওপরের অংশ ঘোমটা দেওয়ার কাজে লাগে আবার যখন কোলের বাচ্চাকে শাড়ি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো তখন তা আঁচল হয়ে গেল।

বৈচিত্র্যময় ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের শাড়ি পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য বহন করে চলেছে। রাজস্থানের বৈশিষ্ট্য বন্ধেজ তো লক্ষ্ণৌয়ের শাড়ি চিকন কাজের জন্য। আবার মধ্যপ্রদেশের চন্দেরি শাড়ির রয়েছে ঐতিহ্যময়ী ইতিহাস। অতীতে রাজপরিবারের সদস্যদের পছন্দের এই চন্দেরি শাড়ি শুদ্ধ সিল্কের সুতো দিয়ে বানানো হয়, সেজন্য এই শাড়ি খুবই মূল্যবান। মান্যতা আছে, অপূর্বসুন্দর এই শাড়িতে যাতে কারুর নজর না লাগে, সেজন্য তাঁতিরা চান্দেরি শাড়ি বানানোর সময় প্রতি মিটারে একটি করে কাজলের টিপ পরিয়ে দেয়। সোনালি জরি দিয়ে বানানো মহেশ্বরী শাড়ির বৈশিষ্ট্য হলো সুন্দর ফুল-লতা-পাতার কাজ; অপরদিকে উত্তরপ্রদেশের বেনারসী শাড়িতে রেশম ও সোনার তৈরি সুতো দিয়ে নকশা বানানো হয়।



তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমের রেশমি সুতোর কাজ থাকে। তবে পাখি, লতা-পাতা এবং রামায়ণ-মহাভারতের বিশেষ চিত্রায়ণগুলি সোনার তৈরি সুতো দিয়ে করা হয়। কেরলের বিখ্যাত শাড়ি মুখ্য চরিত্রম্-এ পারম্পরিক এবং মন্দিরের নক্‌শা বানানো থাকে। কথিত আছে, মহাভারতের শকুন্তলা এই ধরনের শাড়ি পরতেন।

মহারাষ্ট্রের পৈথনী শাড়িতে ময়ূর, টিয়াপাখি এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব চোখে পড়ে। অসমের মুগা শাড়ি নিজস্ব আভিজাত্যের জন্য বিখ্যাত। পশ্চিমবঙ্গের বালুচরি শাড়ি সোনালি রেশম দিয়ে বানানো হয়। এই শাড়িতে রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনার নকশা বানানো থাকে। বলা হয়ে থাকে যে, পরাধীনতার সময় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইউরোপীয় অধিকারীদের চিত্রণও এই শাড়িতে করা



হয়েছিল। শোনা যায় যে, ঢাকার মলমল শাড়ি এত মিহি হতো যে, যেকোনো ছোট্ট কৌটোতে সহজেই ভরে রাখা যেত। কর্ণাটকের কাঞ্জিভরম্ শাড়ি জরির সূক্ষ্ম কাজ এবং জমকালো রঙের জন্য বিখ্যাত। বিয়ের কনের জন্য এই শাড়ি বানাতে ৪-৫ মাস সময় লাগে। এই শাড়ি কেনার সময় একটি প্রমাণপত্র দেওয়া হয়— যাতে লেখা থাকে যে, কোন কোন মূল্যবান জিনিস দিয়ে এটি বানানো হয়েছে। এতে শাড়িটি পুনরায় বিক্রির সময় সঠিক দাম পাওয়া যায়।

শাড়ি পরার ৮০-র বেশি কায়দা আছে। অহল্যাবাই হোলকার ১৭০০ সালে মহেশ্বরে মাহেশ্বরী শাড়ির বাণিজ্য শুরু করেন। বেশি দামের একটি চন্দেরি শাড়ি বানাতে ৬-৮ মাস পর্যন্ত সময় লাগে। এদিকে বালুচরি শাড়িকে ২০০৯ এবং ২০১০-এ বিশেষ রাষ্ট্রপতি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ৯০ লক্ষ টাকার সব থেকে দামি শাড়ি গিনেজ বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে উঠেছে। রাজা রবিবর্মার ৯১টি প্রসিদ্ধ চিত্র সংবলিত এই চেন্নাই সিল্ক শাড়িটির ওজন ৮ কিলোগ্রাম।

আই বি এম-এর কাগনিটিভ সিস্টেম ওয়াটসন এবং ফ্যাশন ডিজাইনার গৌরব গুপ্তা মিলে পৃথিবীর সর্বপ্রথম আর্টিফিশিয়ান ইন্টেলিজেন্স শাড়ি বানিয়েছে। এই শাড়িতে এল.ই.ডি আলো লাগানো আছে। যিনি শাড়িটি পরবেন, তার ব্যক্তিত্ব অনুসারে রঙ বদলাবে। এই শাড়িটি ভোগ উম্যান অব দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ডস্ ২০১৭-তে প্রদর্শন করা হয়েছিল।

এদিকে ভোটের বাজারে শাড়িও প্রভাবিত হয়েছে। শাড়িতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর ছবি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির চিহ্ন এবং নেতাদের ছবি ছাপা শাড়িগুলি মহিলাকর্মীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই রকম অভিনন্দন বর্তমান, সেনাবাহিনীর জওয়ান এবং এয়ার স্ট্রাইক ছাপা শাড়ির বাজারে প্রচুর চাহিদা আছে। পরেও কি বলা যাবে যে শাড়ি বর্তমান যুগে অচল? না, শাড়ি তার নিজস্ব সংস্কৃতি বজায় রেখে যুগের সঙ্গে নিজেকে পরিবর্তন করে চলেছে। বাঙ্গালি নারীদের বহন করে নিয়ে যেতে হবে শাড়ির গৌরবময় পরম্পরা। ■



শিশুর মস্তিষ্কের জন্য দশটি সুপার ফুড

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

সব অভিভাবকই নিজের শিশুর উন্নতি চান। পড়াশোনা, খেলাধুলো নাচ-গান ইত্যাদি সব কিছুতেই সন্তানের পারদর্শিতা কামনা করেন অভিভাবকরা। তবে এর জন্য শিশুর মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাই শিশুর দৈহিক প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার খাচ্ছে কী না, সেদিকে নজর রাখতে হবে।

মানুষের মগজের ওজন দেহের মোট ওজনের মাত্র দুই শতাংশ হয়। মগজের সঠিকভাবে কাজ করতে হলে খাদ্য থেকে লাভ করা মোট ক্যালোরির ২০ শতাংশ ক্যালোরি প্রয়োজন হয়। তার পাশাপাশি এটি কর্মক্ষম হয়ে থাকতে হলে নিয়মিতভাবে গ্লুকোজের প্রয়োজন হয়। মোট কথা, মগজের ঠিকমতো কাজ করতে হলে সঠিক পরিমাণের পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজন।

গবেষকরা প্রমাণ পেয়েছেন যে, উপযুক্ত পুষ্টি না পাওয়া একটি মগজ অ্যাকাডেমিক বিষয়ে কখনও সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। অন্যদিকে বেশিরভাগ শিশুই উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে। সাধারণত দেখা যায় যে স্কুলে যাওয়ার আগে মায়েরা শিশুদের দুধ বা ব্রেকফাস্ট দেন। কখনও আবার টিফিনে দেওয়া খাবার শিশু বাড়ি ফেরত নিয়ে আসে। তাই শিশু যেন খাবার সঠিকভাবে খায়, তার উপর নজর রাখা উচিত। শিশুর শারীরিক বিকাশের জন্য পুষ্টিকর খাবার খাওয়ানো উচিত। সম্প্রতি এ সম্পর্কে গবেষকরা জানিয়েছেন, খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মগজ প্রথমেই পুষ্টি উপাদান শুষে নেয়। এক্ষেত্রে কিছু ব্রেন-ফুড শিশুদের খাওয়ালে মগজের বিকাশ হয়। এতে মগজের কর্মকুশলতা, স্মৃতিশক্তি, মনোসংযোগ ইত্যাদি ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

১০টি সুপার ব্রেন ফুড়

স্যামন মাছ : এই প্রজাতির মাছ ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, ডি এইচএ এবং ইপিএ থাকে। মগজের বিকাশ এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য এই কটি উপাদান খুবই জরুরি। যে সমস্ত শিশু সপ্তাহে দুদিন স্যামন মাছ খায়, তারে মগজ খুবই তীক্ষ্ণ হয়। এছাড়া টুনা এবং ম্যাকারেল নামের সামুদ্রিক মাছগুলিতেও যথেষ্ট পরিমাণে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে।

ডিম : ডিমে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। ডিমের কুসুমে কোলাইন নামের উপাদান থাকে। এই উপাদানটি মগজের বিকাশের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। শিশুদের ব্রেকফাস্ট বা দুপুরের খাবারে ডিম থাকা উচিত।

চিনাবাদাম : চিনাবাদাম বা চিনাবাদাম থেকে প্রস্তুত করা মাখনে ভিটামিন-ই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এটিতে থিয়ামাইন নামের আরেক উপাদান থাকে, যা মগজের শক্তি বাড়ায় এবং স্নায়ুতন্ত্রের গ্লুকোজ শক্তিতে রূপান্তর করতে সাহায্য করে। এছাড়া ছোটো ছোটো টুকরো করা চিনাবাদাম স্যালাড, আইসক্রিম বা ফলমূলের সঙ্গে শিশুদের খেতে দিতে পারেন।

হোল গ্রেন : সারাদিন ঠিকমতো কাজ করার জন্য মগজের নির্দিষ্ট পরিমাণে গ্লুকোজের প্রয়োজন হয়। এই গ্লুকোজ হোল গ্রেনে পাওয়া যায়। এর আঁশ নিয়মিত গ্লুকোজ সরবরাহ করে। এছাড়া এর ভিটামিন বি উপাদানটি শিশুদের স্নায়ুতন্ত্র শক্তিশালী তোলে।

ওটস : সাধারণত জই বা ওটসকে বলা হয় গ্রেন ফর দ্য ব্রেন। ব্রেকফাস্টের সময় শিশুদের জই থেকে তৈরি খাবার খেতে দিলে মগজের শক্তি বাড়ে। আঁশযুক্ত জই খাওয়ালে শিশুরা গোটা দিন এনার্জি পায়। ওটসে ভিটামিন বি, ই, পটাসিয়াম এবং জিংক ইত্যাদি উপাদান থাকে। এই উপাদানগুলি শিশুর মগজ ও শরীরে শক্তি প্রদান করে।

বেরিজ : স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, চেরি ইত্যাদিতে শক্তিশালী অ্যান্টি- অক্সিডেন্ট থাকে। এর রং যত গাঢ় হয়, পুষ্টিগুণ ততই বেশি হয়। এ ধরনের ফলে ভিটামিন সি থাকে। এই ভিটামিন ক্যানসার রোগ প্রতিরোধ করে। শিশুদের স্মৃতিশক্তি বাড়াতে হলে নিয়মিত এ ধরনের ফল খাওয়ানো উচিত। ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডও এ ধরনের ফলে পাওয়া যায়।

সবুজ শাকসবজি : সবুজ শাকসবজিতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, প্রয়োজনীয় ভিটামিন এবং খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট মগজের কোষগুলি শক্তিশালী করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। এছাড়া ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্য শরীরের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে যে কোনও ধরনের আঁশযুক্ত সবজি শিশুর কোষ্ঠ পরিষ্কার করে। সবুজ শাকসবজি শিশুদের যে কোনও প্রকারেই খাওয়ানো যায়।

দুই ও দই : মগজের পেশি, এনজাইম, নিউরোট্রান্সমিটারের বিকাশের জন্য প্রোটিন ও ভিটামিন বি খুবই প্রয়োজন। দুধ ও দইয়ে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট থাকে। তাই শিশুদের নিয়মিত দুধ ও দই খাওয়ানো উচিত। এছাড়া জিংক তথা খনিজ দ্রব্যে থাকা মাংস, তিসি, সয়াসডি, খনিজ লবণ নিয়মিত ভাবে দিতে হবে। ■

গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধে এগিয়ে বাঙ্গলা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিরোধী নেত্রী ছিলেন তখন প্রায়শই সিপিএম তথা বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারের অভিযোগ করতেন। সিপিএম পশ্চিমবঙ্গকে বিরোধীশূন্য করতে চায়, এ রাজ্যে গণতন্ত্র নেই ইত্যাদি বলে তিনি অনেকবার ঝড় তুলছেন। এমনকী বিরোধী (মূলত তৃণমূল) রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ওপর সিপিএমের অত্যাচার এবং রাজনৈতিক খুনের প্রতিবাদে বন্‌ধও ডেকেছেন বহুবার। তাই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আশা করেছিল ক্ষমতায় আসার পর মমতা পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাসিত গণতান্ত্রিক মুল্যবোধ আবার ফিরিয়ে আনবেন।

কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখছি? সিপিএম গণতন্ত্রকে নির্বাসিত করেছিল, তৃণমূল একেবারে শেষ করে ছেড়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় আমরা তৃণমূলের জল্লাদ বাহিনীর দৌরাত্ম্য দেখেছি। একই ঘটনা আমরা দেখেছি এবারের লোকসভা নির্বাচনে। বিজেপিকে আটকানোর জন্য তৃণমূল শুধু রাজনৈতিক লড়াই লড়ছে না, প্রশাসনকেও ব্যবহার করছে ইচ্ছে মতো। বিজেপি কর্মীদের মারধোর তো সাধারণ ঘটনা, জেলায় জেলায় খুন হচ্ছেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় থেকে ধরলে এখনও পর্যন্ত ৪২ জন মারা গেছেন। মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়ে সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের হয়রান করা হচ্ছে। ভোটের দিন মুসলমান-প্রধান অঞ্চলের বুথে অবাধে চলছে রিগিং, ছাপ্পা দেওয়া। কিন্তু এত কিছু করেও বিজেপিকে থামানো যাচ্ছে না। তাই ডায়মন্ডহারবারের সাতগাছিয়ায় হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের নির্যাতন শুরু হয়েছে। মসজিদ থেকে হিন্দুদের এলাকা ছেড়ে চলে যেতে বলা বলা হচ্ছে। ডায়মন্ডহারবারে ভোট গ্রহণ ১৯ মে। ভোটের আগেই সাতগাছিয়া-সহ ডায়মন্ডহারবারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে হিন্দুশূন্য করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে তৃণমূল।

এবারের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে মোদী-ঝড় বইছে। সেটা বুঝে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট প্রচারের শুরু থেকেই বিজেপির নেতাদের ওপর খড়্গহস্ত। রাজ্যে সভাসমিতি করতে হলে রাজ্য সরকারের আগাম অনুমতি প্রয়োজন। বিজেপি সেই অনুমতি জোগাড় করলেও, বহুক্ষেত্রে রাজ্য সরকার শেষ মুহূর্তে বাতিল করেছে। এর উদ্দেশ্য বিজেপির সভা বানচাল করা এবং লোকসমক্ষে তাদের হেয় করা। এই উদ্দেশ্যেই রাজ্য সরকার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে পুরুলিয়ায় হেলিকপ্টার নামানোর অনুমতি দেয়নি। যাতে তিনি সভা করতে না পারেন। যোগী আদিত্যনাথ বোকারোয় নেমে ওখান থেকে গাড়িতে



পুরুলিয়ায় আসেন। মোদীর ব্রিগেডের সভা হবে কি হবে না তাই নিয়ে সংশয় ছিল। প্রথমে একটি দিন ঠিক করে পরে তা বাতিল করা হয়। এরপর অল্পদিনের ব্যবধানে আরেকটি নতুন দিন ঠিক করা হয়। তৃণমূলনেত্রী ভেবেছিলেন এত অল্প সময়ে বিজেপি ব্রিগেড ভরাতে পারবে না। কিন্তু মাত্র পনেরো দিন সময় পেলেও বিজেপির সাংগঠনিক শক্তি এবং মোদী ম্যাজিকের জোরে সেদিন ব্রিগেড কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। নরেন্দ্র মোদীর ঠাকুরনগরের সভা নিয়েও অনিশ্চয়তা ছিল। প্রথমে যে জায়গায় হবার কথা ছিল সেখানে হয়নি। পরে যে জায়গাটি বাছা হয় বিপুল জনসমাগমের নিরিখে সেটি ছিল ছোটো। ফলে সেদিন কিছু বিশৃঙ্খলা দেখা গিয়েছিল।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের দুটি সভা বাতিল হয়েছে। একটি যাদবপুরে অন্যটি বারুইপুরে। দুটি ক্ষেত্রেই সরকারি টালবাহানা দায়ী বলে জানা গেছে। বারুইপুরে যে মাঠে সভা হওয়ার কথা ছিল তার মালিক অদ্ভুত কারণ দেখিয়ে অনুমতি প্রত্যাহার করে নেন। তিনি বলেন, ওই মাঠে নাকি আগে থেকেই অন্য একটি রাজনৈতিক দলের সভা করার কথা ছিল। প্রশ্ন হলো, আগে থেকে যখন কথাই ছিল তখন বিজেপিকে সভা করার অনুমতি দেওয়া হলো কেন? অভিযোগ, তৃণমূলের চাপেই ওই ব্যক্তি শেষ মুহূর্তে অনুমতি প্রত্যাহার করেন। তবে অমিত শাহ সবথেকে মারাত্মক তৃণমূলি রাজনীতির সম্মুখীন হয়েছেন সম্প্রতি বিজেপির সমর্থনে উত্তর কলকাতায় আয়োজিত একটি পদযাত্রায়। সেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীরা তাকে কালো পতাকা দেখায়। পরে, বিদ্যাসাগর কলেজের সামনে দিয়ে যাবার সময় টিএমসিপি-র কর্মীরা ছাদ থেকে পদযাত্রার ওপর ইটবৃষ্টি করে। পেট্রোল বোমাও ছোঁড়া হয়। এই ঘটনায় পনেরো জন বিজেপি কর্মী মারাত্মক আহত হয়েছেন। একজন মারা গেছেন। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন অমিত শাহ। পদযাত্রা ভণ্ডুল করতে না পেরে টিএমসিপি কর্মীরা কলেজের নিজেরাই বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে বিজেপির ঘাড়ে দায় চাপানোর চেষ্টা করে। কিন্তু বিদ্যাসাগরকে নিয়ে রাজনীতি করার মূল হোতা কে সেটা এখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত তীর্থপ্রতিম সাহা এবং অভিষেক মিশ্র দুজনেই তৃণমূল কর্মী। এরপরও কি পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার প্রক্রিয়া থামবে? না। অন্তত যতক্ষণ তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা আছে ততক্ষণ, না।

প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর এবং গোয়েন্দা গিন্নির অলীক কুনাট্য

সনাতন রায়

না। তাঁর কোনও শার্লক হোমসকে ডাকার প্রয়োজন পড়ে না। ব্যোমকেশ বক্সী, ফেলুদা, কাকাবাবু, গার্গী, নিদেনপক্ষে ডাঃ বাসু কিংবা কিরীটি রায়কেও নয়। কারণ তিনি গন্ধ শুঁকে বলে দিতে পারেন, অপরাধের চরিত্র কেমন! কেই-ই বা অপরাধী! মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার দিন কয়েকের মধ্যেই যেমনটি বলেছিলেন পার্কস্ট্রিটে সুজেটনাম্নী তরুণীর ধর্ষণের ঘটনায়— 'এরকম কিছুই ঘটেনি। খদ্দেরদের সঙ্গে ঝামেলা। যেমনটি কামদুনীর 'নির্ভয়া' ধর্ষণের পর বলেছিলেন—'সব মিথ্যা, সব সাজানো।' কখনও বলেছেন— 'বাচ্চা ছেলেরা করে ফেলেছে।' কামদুনীর দুই গ্রামীণ মহিলা, মেদিনীপুরের এক নিতান্ত সাদামাটা পুরুষ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণী ছাত্রীকে নির্দ্বিধায় সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন 'মাওবাদী' বলে। সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। এবারও তাই কয়েক মিনিটের জন্য বিদ্যাসাগর কলেজে ঢুকে বলে দিলেন --- 'বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে বিজেপি। বাঙ্গলার ইতিহাস, বাঙ্গলার সংস্কৃতিকে কলুষিত করেছে।'

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, মহান নেত্রী, সততার প্রতিমূর্তি, সদা সত্য কথা বলিবার মতো মহিলা-যুধিষ্ঠির মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কী অপার শক্তি! কী দৈব মহিমা! কী ধুরন্দর গোয়েন্দাসম অন্তর্ভেদী দৃষ্টি।

তা বেশ! কিন্তু গত ১৪ মে বিদ্যাসাগর কলেজে বিদ্যাসাগরের মূর্তি টুকরো টুকরো করার পর থেকেই জনগণের যেসব প্রশ্নের ঝড় সোশ্যাল মিডিয়ায় আছড়ে পড়ছে, বাসে ট্রামে অবিরাম চলেছে প্রশ্নের তির, সন্দেহের ঘনঘটা মাকড়সার জালের মতো জড়িয়ে ধরছে মুখ্যমন্ত্রীর গোয়েন্দাগিরিকে, তার কোনও জবাব মিলছে না। যেমন—

প্রথমত, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহর রোড শো ছিল পূর্বঘোষিত এবং অনুমোদিত। কিন্তু রাতের অন্ধকারে তার রোড শো-র নির্দিষ্ট পথের দু-পাশ থেকে কেন খুলে দেওয়া হলো সব ফ্লেক্স, সব হোর্ডিং? কারা খুলল? গোয়েন্দা মুখ্যমন্ত্রী নির্বাক!

দ্বিতীয়ত, লক্ষ মানুষের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় টগবগ করে ফোটা রোড শো যখন উৎসবের আনন্দে মাতোয়ারা, তখন কেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল প্রবেশপথে তৃণমূল কর্মীদের কালো পতাকা দেখানোর অনুমতি দেওয়া হলো? কেনই বা মূল প্রবেশপথের প্রাচীর সম দরজা হাট করে খুলে রাখা হলো? কেনই বা এক কর্মীকে দেখা গেল কোমরে হাত দিয়ে 'ডোন্ট কেয়ার' বডি ল্যাঙ্গুয়েজের প্রদর্শন করতে? কালো পতাকাধারীদের তো চিরকালই দূরে রাখাটাই নিয়ম।

তৃতীয়ত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরেই ছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের গেট। প্রেসিডেন্সি যা মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় শহুরে মাওবাদীদের আখড়া— সেখানে কেউ কালো পতাকা দেখাল না। একটা ছাত্র বা ছাত্রীকেও দেখা গেল না স্লোগান দিতে। আশ্চর্য লাগছে না? মুখ্যমন্ত্রী নির্বাক!

চতুর্থত, ঝামেলার শুরু বিদ্যাসাগর কলেজে সামনে দিয়ে ঢাক- ঢোল শঙ্খধ্বনিতে মাতোয়ারা রোড শো বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর পরই। আচমকাই মিছিলের ওপর শিলাবৃষ্টির মতো শুরু হলো ইটবৃষ্টি। ফটাফট ফাটল চারটি মাথা। হৈ হৈ ব্যাপার। রৈ রৈ কাণ্ড! সময়টা তো 'ঠিক দুক্কুরবেলা' ছিল না যে ভূতে ঢিল মারবে! কে মারল? কারা ছিল বিদ্যাসাগর কলেজের দোতলায়, তিনতলায় কিংবা ছাদে? মুখ্যমন্ত্রী নির্বাক! ইট মারলে পাটকেল খেতে হবে। কেউ তো রসগোল্লা ছুঁড়বে না! স্বাভাবিকভাবে প্রতি আক্রমণ হয়েছে। ভিডিয়োতে স্পষ্ট, রাস্তায় তখন বড়ো জোর গোটা ১০/১২ যুবক। কেউ ভিতরে ঢোকেনি। তৃণমূল বলছে, ভিতরে তখন ক্লাস চলছিল। তা বেশ! তাহলে অন্তত শ' দুই-তিন ছাত্র-ছাত্রী তো ছিল ভিতরে। দশ-বারোটা ছেলে গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকল। বিদ্যাসাগরের মূর্তি কাঁচের বাক্স না ভেঙে বের করে বাইরে এনে আছাড় মেরে টুকরো টুকরো করে দিল। আর ছাত্র-ছাত্রীরা ভিতরে বসে তা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করল। অস্বাভাবিক লাগছে না? মুখ্যমন্ত্রী নির্বাক।

মনস্তত্ত্ব বলে, রাগের মাথায় কেউ যদি কিছু ভাঙে তো সে সেটা তৎক্ষণাৎ সেখানে দাঁড়িয়েই ভাঙবে। ঘাড়ে করে বাইরে বয়ে এনে লোকসমক্ষে ভাঙবে না। বিদ্যাসাগর কলেজে কিন্তু ঘটেছে উল্টোটাই। কাঁচের বাক্স ভাঙেনি। মূর্তি ভাঙা হয়েছে বাইরে এনে। মুখ্যমন্ত্রী কি গন্ধটা ঠিকমতো পাচ্ছেন না?

অত বড়ো রোড শো। পুলিশ কোথায়? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন নিষ্কর্মা পুলিশ ছাড়া গোটা রাস্তায় পুলিশ ছিল না। বিদ্যাসাগর কলেজের সামনে তো নয়ই। কেন? পরিকল্পিত? মুখ্যমন্ত্রী স্পিকটি নট!

সরকার যে ভিডিয়ো দেখাচ্ছে না, তাতে দেখা যাচ্ছে মূর্তি ভাঙছে ব্লু শার্ট পরা এক যুবক আর হলুদ পঞ্জাবি পরা এক যুবক। কিছুক্ষণ পরে মুখ্যমন্ত্রী যখন সদলে তদন্তে এলেন বিদ্যাসাগর কলেজে, তখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওই দুই যুবককে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে। কেন? কারা ওরা? মুখ্যমন্ত্রীর ঠোঁটে তর্জনী!

রীতিমতো সাজানো চিত্রনাট্যের মতোই মুখ্যমন্ত্রীর পাশে এসে দাঁড়াল এক ছাত্রী। তাঁর মাথায় একটা ব্যান্ডেজ। কিন্তু ক্ষতস্থানের ওপর জড়ানো ব্যান্ডেজের রক্তটা তো রক্তের রঙের নয়। বরং বেশি মিল আলতার সঙ্গে। কেন? তাছাড়া অতখানি রক্ত ছড়িয়ে পড়েছে ব্যান্ডেজে অথচ মেয়েটির চোখ মুখ ফোলেনি। কোনও উদ্বেগের চিহ্নও নেই। ব্যাপারটা কী? ছাত্রটি এল। ডান হাতে জড়ানো একটা নতুন স্লিং। কতক্ষণ আগে কেনা? কলেজ স্ট্রিটের কোনো দোকান থেকে? বিলটা আছে নিশ্চয়ই! মুখ্যমন্ত্রীর জবাব নেই!

অভিষেক শর্মা নামক 'ধর্ষক' হিসেবে ইতিমধ্যেই সাজাপ্রাপ্ত এক স্থূলদেহী ভদ্রলোক (ছাত্র নয় নিঃসন্দেহে)-কে দেখা গেল— টিভি চ্যানেলগুলিকে বাইট দিতে। কোন বিষয়ে কোন

বর্ষের ছাত্র উনি? যদি ছাত্র না হন, তাহলে কী করছিলেন ওখানে? মুখ্যমন্ত্রীর কানে তুলো, মুখে মুলো। কোনোভাবেই জবাব দেন না সেই মহার্ঘ প্রশ্নটির— ম্যাডাম, একটু বলবেন, কেন বন্ধ করে রাখা ছিল কলেজের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা? আর সেদিন দুপুরে কলেজে ইউনিয়ন রুমের সভায় ঠিক কী কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল আপনার নির্দেশ মতো?

বাইরে মিছিলে যে অংশগ্রহণকারীদের মাথা ফাটল, তারা হিন্দিভাষী। সম্ভবত অন্য এলাকার তরুণ এরা। এরা বিদ্যাসাগর কলেজ চেনেন? বিদ্যাসাগরকে চেনেন? তাহলে এরা মূর্তি ভাঙবেন কেন? মুখ্যমন্ত্রীর মুখে ভাষা নেই।

গত কদিন ধরেই ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে 'যুবরাজ' প্রার্থীর নির্দেশে চলেছে হিন্দু বিতাড়ন। গ্রামের বাতাস কান্নায়, আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠেছে। সংবাদমাধ্যমগুলিতে কোনও খবর নেই। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছেয়ে যাচ্ছে ভিডিয়ো। তাহলে কি বিদ্যাসাগরকে নিয়ে মাতামাতি আসলে মানুষের চোখ ডায়মন্ডহারবারের দিক থেকে অন্যদিকে ঘোরাতেই? যাতে হিন্দু বিতাড়নের ঘটনা কোনওভাবেই রাজ্যে হৈ চৈ ফেলতে না পারে? বাঃ! চমৎকার মুখ্যমন্ত্রী! লা জবাব!

এই মুহূর্তে রাজ্যজুড়ে তৃণমূলী কর্মীবাহিনী, তৃণমূলি বুদ্ধিজীবীরা তৃণমূলি আমলাবাহিনী, তৃণমূলি পুলিশবাহিনী তৃণমূলি স্বৈরতান্ত্রিক নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কুমিরের কান্না কাঁদছেন। বিদ্যাসাগরের ভাঙা মূর্তিকে জড়িয়ে ধরে। অপদার্থ শিক্ষামন্ত্রী যিনি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্রম থেকে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়কে হঠিয়ে দিয়ে যিনি প্রথম শ্রেণীর বইতে ঢোকায় শরৎকালে চারিদিকে দুর্গাপুজো আর ঈদের খুশি', দ্বিতীয় শ্রেণীর বইতে 'আমার মায়ের ছবি'তে দেখানো হয় এক মুসলিম রীতিতে সাজানো মহিলার সাজ, পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে লেখা হয়, 'বাঙ্গালির সবচেয়ে বড়ো উৎসব দুর্গাপুজো আর ঈদ', ষষ্ঠ শ্রেণীর বইতে পত্ররচনার নমুনা হিসেবে ছাপা হয় মুসলমান রীতিতে লেখা পত্র, অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে অদ্ভুত আতিথেয়তার নজির হিসেবে আরবি চরিত্রকে তুলে ধরা হয়, তাঁরই লেজ ধরে গোবধে মাতোয়ারা অবোধ সুবোধের মতো কবিরা 'বিদ্যাসাগর'কে নিয়ে নতুন রম্যরচনা সৃষ্টি করেন কলকাতার পথসভায়। আর মুখ্যমন্ত্রী মুখে কুলুপ এঁটে শুধু মোদীকে গালাগাল দেন। যেমন যুক্তিহীন ভাষায় বিকৃত মস্তিষ্কের মতো চীৎকার করেন— 'অযোধ্যা পাহাড়, শুশুনিয়া পাহাড়, জয়চণ্ডী পাহাড়, দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির, তারাপীঠের কালী মন্দির, পাথরচাপড়ি, ঈদগাহ সব গড়ে দিয়েছি', তেমনি গোয়েন্দা গিন্নির মতো লজিক বিহীন রক্তচক্ষু দেখিয়ে সব বিষয়েই পণ্ডিতি মতামত দিয়ে দেন সবজান্তা মুখ্যমন্ত্রী— সেই মমতা ব্যানার্জি যিনি গণতন্ত্রের মন্দির রাজ্য বিধানসভার অ্যান্টিক আসবাবপত্রগুলি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ভাঙিয়েছিলেন দলের 'সুবোধ বালক'দের দিয়ে। রীতিমতো ধ্বংসলীলা চালিয়ে দিলেন এভারেস্ট-সম নির্লজ্জতার নজির রেখে। সেদিন তার ভয়ংকর রূপ কোনও অংশে ধ্বংসের প্রতীক নাদির শাহর চেয়ে কম কিছু ছিল না।



তিনি যতই চিৎকার করুন— বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে বিজেপি— মানুষ তা বিশ্বাস করছে না। নাক থেকে নস্যির গুঁড়ো ঝেড়ে ফেলার মতোই ঘৃণার সঙ্গে ঝেড়ে ফেলেছে মুখ্যমন্ত্রীর অবান্তর গোয়েন্দা তত্ত্ব। কারণ মানুষ জানে— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গলার মনীষী-প্রীতি সীমাবদ্ধ কয়েকটি মেট্রো স্টেশনের নামকরণের মধ্যেই।

আজ যখন পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে চলছে ধ্বংসের রাজনীতি, লুট-রাহাজানির রাজনীতি, আজ যখন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য সমাবেশে বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী গৃহবধূদের পরকীয়া করতে উপদেশ দিচ্ছেন, আজ যখন পশ্চিমবঙ্গের বুক থেকে হিন্দু ঐতিহ্য, হিন্দু সনাতনী ধারাকে চিরতরে মুছে দেবার জন্য ঘৃণ্য চক্রান্তের নেতৃত্ব দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, যখন রাতদিন মিথ্যার পাহাড় গড়ে জনসমাবেশে দাঁড়িয়ে তাকে বারবার বলা হচ্ছে— আমি মিথ্যা কথা বলি না, আমি চোর নই, আমি হত্যাকারী নই' এখন তিনি যতই চিৎকার করুন— বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে বিজেপি— মানুষ তা বিশ্বাস করছে না। নাক থেকে নস্যির গুঁড়ো ঝেড়ে ফেলার মতোই ঘৃণার সঙ্গে ঝেড়ে ফেলেছে মুখ্যমন্ত্রীর অবান্তর গোয়েন্দা তত্ত্ব। কারণ মানুষ জানে— মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গলার মনীষী-প্রীতি সীমাবদ্ধ কয়েকটি মেট্রো স্টেশনের নামকরণের মধ্যেই। শুধু রাজনৈতিক মঞ্চে কৃতিত্ব নেবার জন্যই মনীষীদের জীবন, কর্ম ও অবদান সম্পর্কে একজন ভালো মেধা স্কুল ছাত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার ক্ষমতাও তাঁর নেই— তাও জানে বাঙ্গলার মানুষ। বাঙ্গলার ট্রাফিক সিগন্যালে রবীন্দ্রসংগীত বাজিয়ে তিনি বাঙ্গলার সংস্কৃতির কোনো উন্নয়ন ঘটাননি। বরং বাঙ্গলার সুস্থ সংস্কৃতিকে রাজপথের ধুলোয় টেনে এনেছেন। যেমনভাবে নিজের কর্মীবাহিনীকে কাজে লাগিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তিকে গুঁড়িয়ে দিয়েছেন রাজপথে ফেলে। বাঙ্গলার সংস্কৃতি আজ অপমানিত, ধর্ষিতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এর জবাব দিতে হবে। দিতেই হবে। আজ না হয় কাল। কাল না হয় পরশু। পালিয়ে গিয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন না। বাঙ্গলার মানুষ প্রতিশোধ নেবেই। পরিবর্তনের মাধ্যমে। বদলের মাধ্যমে। সেদিন এসব প্রশ্নের জবাব মানুষকেই দিতেই হবে আপনাকে। এটাই হবে আপনার শেষ বিচার।

বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা
হিন্দু-মুসলমান, বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি ইত্যাদি তত্ত্ব

অভিমন্যু গুহ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি যাঁরা ভেঙেছেন, তাঁরা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছেন। এই মূর্তিভঙ্গকারীদের যত দ্রুত সম্ভব শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এর জন্য বিদ্যাসাগরের মূর্তিটি, কলেজের যে ঘরে ছিল তার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। এই ফুটেজ দেখতে এত দেরি হচ্ছে কেন? অপরাধীদের শনাক্ত কি করা গেল? এই ধরনের প্রশ্নগুলির উত্তর রাজনৈতিক জটিল ঘূর্ণিপাকে আরও কঠিন হয়ে যাচ্ছে। অগত্যা বেশ কিছু 'সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্স' বা 'পারিপার্শ্বিক প্রমাণে'র সাহায্য নিতে হচ্ছে। কংগ্রেস নেতা অরুণাভ ঘোষ যেমন বলেছেন : 'আমি বিজেপির ঘোর বিরোধী, কিন্তু পারিপার্শ্বিক প্রমাণ বলছে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা তৃণমূলেরই কাজ।'

পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ভিত্তিতেই যদি বিদ্যাসাগর কলেজে বিদ্যাসাগরের মূর্তিভঙ্গকারীদের চিহ্নিত করতে হয়, তবে ইতিহাসটাকেও একটু বুঝে নিতে হবে। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার রেকর্ড এ রাজ্যে এখনও পর্যন্ত স্বীকৃতভাবে একটি দলেরই রয়েছে; যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি আস্থা হারিয়ে, এমনকী ভারতবর্ষের সংবিধানের প্রতিও যাবতীয় অসম্মান ও অনাস্থা দেখিয়ে কেবল অগণতান্ত্রিক উপায়েই ক্ষমতা দখল করতে চায়নি, চীনের প্রেসিডেন্ট মাও জে দঙের প্রতি বিশেষ আনুগত্য দেখিয়ে ভারতের মাটিতে বসে, ভারতেরই খেয়েপরে ভারত ভূখণ্ডকে চীনের ক্রীতদাসে পরিণত করতে চেয়ে, 'চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারম্যান' স্লোগানে মাতিয়ে দিয়েছিল, চলতি কথায় যাদের নকশাল বা মাওবাদী বলা হয় ১৯৭০-এর গোড়ায় কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মর্মরমূর্তির শিরচ্ছেদ করে তাঁরা 'বুর্জোয়াতন্ত্র', 'সাম্রাজ্যবাদের দালালি'র বিরুদ্ধে বিজয়-নিশান উদ্দীপিত করেছিলেন।

বর্তমান সময়ে মাওবাদীদের অস্তিত্ব কোথায়? প্রথমত, ছত্তিশগড়-লালগড় ইত্যাদির জঙ্গলবহুল এলাকায় রয়েছে। সে সমস্ত জায়গায় একপ্রকার নারকীয় দুষ্কৃতীরাজ চলে। যারা এগুলি সরাসরি পরিচালনা করে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা বিশেষ নেই কিন্তু শহরে বসে যারা এদের মদত জোগায়, যাদের 'শহুরে নকশাল' বা 'আরবান নকশাল' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, এই দ্বিতীয় প্রকার নকশাল-গোষ্ঠী শুধুমাত্র ভারতবর্ষের সুরক্ষাই নয়, ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পক্ষেও বিপজ্জনক। এদেরকে এখন আরেকটি বিশেষ নামেও চিহ্নিত করা হচ্ছে, সেটি হলো—'টুকরে টুকরে গ্যাং'। অর্থাৎ যারা স্লোগান দেয় 'কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি', 'মণিপুর মাঙ্গে আজাদি', 'ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, ইনসাল্লাহ, ইনসাল্লাহ।' বাঙ্গলায় এদের মুখপত্রটিকে সবাই চেনে, যাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপরে বঙ্গিমচন্দ্র রচিত দেশপ্রেমোদ্দীপক স্তোত্র থাকে, আর সম্পাদকীয়গুলি প্রধানত তীব্র ভারতবিদ্বেষে পরিপূর্ণ থাকে। এই 'বাজারি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকার দোর্দণ্ডপ্রতাপ ও সর্বময়ী কর্ত্রীর একটি উত্তর সম্পাদকীয়, অমিত শাহের মিছিল আর বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙাকে কেন্দ্র করে। অসামান্য চিত্রনাট্যে তিনি হাজির করেছেন তাঁর বাড়ির 'সুভাষিণী ব্যক্তিত্বময়ী পরিচারিকা' মমতাজ, ও তাঁর গাড়ির চালক রফিকুল ইসলামকে। এই দুই মুসলমান (ভুল করেও ভাববেন না এমন সাম্প্রদায়িক বিশেষণ স্বস্তিকার দেওয়া, খোদ লেখিকাই এক বিশেষ উদ্দেশ্যে এই চিহ্নিতকরণ করেছেন) চরিত্রই বেজায় ক্ষিপ্ত কেন বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা হলো তা নিয়ে? এবিষয়ে রফিকুলের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ : 'অবাঙালি গুন্ডা ছাড়া এমন কাজ কেউ করতে পারে না।'

চিত্রনাট্য এগিয়েছে নিতান্ত মসৃণগতিতে, বাঙ্গালিয়ানার সঙ্গে ভারতীয়ত্ব পৃথক হয়েছে, জুড়ে গিয়েছে 'ভারতীয় মুসলমানত্ব'।

আরও এককাঠি উপরে গিয়েছে বিদ্যাসাগরের নারী-সংস্কারের প্রভাব, মুসলমান সমাজকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে মমতাজকে দিয়ে লেখিকা প্রত্যক্ষ করেছেন, ঠিক অনেকটা মমতা-কে দিয়ে যেমন বাঙ্গলার উন্নয়নকে প্রত্যক্ষ করা যায় সেভাবেই আর কী! তারপরেই ঝুলি থেকে বেড়াল বেরিয়ে পড়েছে। অমিত শাহের রোড শো নাকি মুসলমান অধ্যুষিত কলাবাগানের জনতাকে 'ভয়' দেখাতে বাধ্য করা হয়েছিল। পাঠক নিশ্চয়ই এবার হাসতে শুরু করেছেন। সত্যি কথা বলতে কী, খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এ জাতীয় তত্ত্ব আবিষ্কার করতে সমর্থ হননি। যা করেছেন বাজারি সংবাদমাধ্যমের ডিফ্যাক্টো এডিটর। সবশেষে তিনি মনের কথা বলেছেন, ২০১৯-এর নির্বাচন



নরেন্দ্র মোদীকে পরাস্ত করার নির্বাচন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে এখন ভেবে লাভ নেই। সুতরাং মোদীকে হারাতে মমতাকেই ভোট দিন, এককাট্টা হয়ে, বাঙ্গালিত্ব বাঁচানোর তাগিদে।

কী ভাবছেন উক্ত সম্পাদকীয়তে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার গল্প শেষ পর্যন্ত 'তৃণমূলকে ভোট দিন', 'মোদীকে রুখুন' প্রচারে পর্যবসিত হলো কেন? আসলে অঙ্কটা খুব জটিল। বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদকের নাম জানেন তো?

সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘটনার দিন রাত থেকে একটি বাণী ছড়িয়ে পড়ছিল— 'রাজ্যের প্রতিটি মাদ্রাসায় বিদ্যাসাগরের মূর্তি চাই।' শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অতি কু-চেষ্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন। সেগুলি ধোপে টেকেনি। এলাকাবাসী থেকে রাজ্যবাসী, এমনকী মুখে স্বীকার না করলেও মিডিয়াও বুঝে গিয়েছিল যে দুষ্কৃতীরা একটি শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর হামলা করার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিদ্যাসাগর কলেজে তৃণমূলের পতাকা হাতে জমা হয়ে গো-ব্যাক স্লোগান, কালো পতাকা প্রদর্শন ইত্যাদি নোংরামি করছিল, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙাও তাদেরই কাজ। নইলে সমস্ত ভাঙচুর হওয়া দ্রব্য অকুস্থলেই থাকলো, আর খালি বিদ্যাসাগরের মূর্তিই কলেজ চত্বরের বাইরে ফেলে প্রেসকে ডাকা হলো!

আসলে কয়েক বছর আগেও যা কল্পনা করা যেত না, এখন তাই বাস্তবায়িত হচ্ছে। মমতা ব্যানার্জির রাজত্বে সংখ্যালঘু তোষণের চরম পরিণামে বাঙ্গলার শিক্ষাঙ্গনগুলি সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সেদিক থেকে নজর ঘোরাতেই বাংলা ও ভারতের আরবান নকশালরা 'হিন্দুত্বে'র জিগির তুলে রাজ্যবাসীকে বিপদের জুজু দেখায়। যে উপাসনা-পদ্ধতিতে মূর্তিপুজো ঘৃণিত, বিদ্যাসাগর মূর্তি তাদের হাতেই কলুষিত হয়েছে কিনা এই সন্দেহ-প্রবণতা থেকেই 'বিদ্যাসাগরের মূর্তি চাই, প্রতিটি...' জাতীয় বাণী রাষ্ট্র হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। নজর ঘোরাতে নকশালি মুখপত্রের সেই উত্তর-সম্পাদকীয়টি যেভাবে সাজানো হয়েছে গল্প-গাছা দিয়ে, তাতে এই সন্দেহই আরও জোরাল হয়। এই প্রসঙ্গে বলি, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বিদ্যাসাগর কলেজের এক কৃতী ছাত্র সংবাদমাধ্যমের ভণ্ডামির প্রতিবাদ করে ফেসবুকে এক পোস্ট দেয় যে বিদ্যাসাগর মূর্তি ভাঙার দুষ্কৃতীকারীরা তৃণমূলিরাই। মুহূর্তে এই পোস্ট ভাইরাল হয়ে যায়। ছাত্রটির ওপর চাপ আসতে থাকায় রাতে সে ফেসবুক ডি-অ্যাকটিভ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার, তা হয়ে গিয়েছে। ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপে সবাই কপি-পেস্ট করতে থাকে এই বয়ান, যার প্রথম লাইনটি ছিল 'আমি বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র।' সোশ্যাল মিডিয়া নাড়াচড়া করার অভ্যাস যাঁদের আছেন, তাঁরা জানেন এসব ক্ষেত্রে অনেকে তলায় সংগৃহীত বা কালেকটিভ লিখে দেন। অনেকেরই আবার এসব ঋণস্বীকারের কোনও বালাই নেই। কিন্তু তাই বলে এসব ভাইরাল পোস্টের সারবত্তা বিন্দুমাত্র হারায় না। এখানে সুকৌশলে দেখা গেল ছাত্রটির পোস্ট সমেত বাদবাকি যেখানে যার যা চোখে পড়েছে সেসব তুলে ধরে এ সমস্তই বিজেপির আই টি সেলের প্রচার বলে চালানো হলো। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবার মুখে 'আমি বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্র' গোছের সিম তৈরি হয়ে গেল। মিডিয়া হাউসগুলো পর্যন্ত সেই জলজ্যান্ত কৃতী গবেষণারত ছাত্রটির 'হদিশ' করতে পারল না (সাংবাদিকতার কী করুণ অবস্থা, আমরা তাই তার সামাজিক নিরাপত্তার কারণে নামোল্লেখ করলাম না), সোশ্যাল মিডিয়ায় 'গসিপ'কেই তারা ছাপার অক্ষরে লিখে দিল। বাজারি মিডিয়ার সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ লেখিকা সেই পরিকল্পিত স্রোতেই গা ভাসালেন বোধহয় পরিকল্পনা মাফিকই— সবার বয়ানে 'দরজা পেরোতে', কীভাবে 'দরজা পেটোতে' পরিণত হলো এই প্রশ্ন তুলে? কপি-পেস্ট করলে তাই হয় মাননীয়া! কাশ্মীরি জাতীয়তাবাদ বোঝেন, জইশকে সমর্থন করে ভারত সরকারকে টোন কাটতে পারেন, আর এটুকু বুঝবেন না তা হতে পারে।

কী ভাবছেন, অহেতুক একটি বাজারি সংবাদমাধ্যমের পেছনে পড়েছি। ২০১৮-র ২৩ মার্চ ওই পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠি পড়ে নিন, যেখানে ত্রিপুরার বিলোনিয়ায় লেনিন মূর্তি ভাঙার পরিপ্রেক্ষিতে ওই চিঠিতে কলকাতায় নকশালদের বিদ্যাসাগর মূর্তি ভাঙাকে এমন 'সিমপ্যাথাইজ' করা হয়েছিল (মূর্তি ভাঙা নাকি মূর্তি গড়ার তাগিদে) যে সবাই বুঝে গিয়েছিল চোরের মন বোঁচকার দিকে পড়ে আছে। বাম-রাজত্বকালে বিলোনিয়ায় জমি-মালিকের জমি দখল করতে সুবিশাল লেনিনমূর্তি গড়ে তোলা হয়েছিল (যে কৌশলে বাম-তৃণমূল এরাজ্যে বহু বেসরকারি-সরকারি জমি দখল করেছে), এই সত্যকে আড়াল করতে এবং অবশ্যই বিজেপিকে 'অসভ্য, বর্বর' হিসেবে চিহ্নিত করতে ও নকশালি বর্বরতার দাঁত-নখ আড়াল করতেই ওই ধরনের চিঠি লেখা আর তা প্রকাশিতও হয়েছিল। ভাঙার রাজনীতি মাওবাদী- নকশালেরাই করে, শহুরেরা কথায় আর গ্রামীণরা কাজে। সুতরাং নকশালি মুখপত্রের দৌলতেই এদের আরও একবার চেনার সুযোগ 'বাঙ্গালি' পাচ্ছে। সত্যিই, 'চিনে নেওয়া গেল।'

মূর্তি ভাঙার মতো একটি দুষ্কৃত-কর্মে যে হিন্দু-মুসলমান, বাঙ্গালি-অবাঙ্গালি এতসব সিরিয়াস বিষয় জড়িয়ে থাকতে পারে তা সাধারণভাবে ভাবা যায় না। কিন্তু যখন দেখা যায় জনৈক নকশাল সোশ্যাল মিডিয়ায় ভোট শুরুর প্রাক্কালে বিদ্যাসাগরমশাইকে ব্রিটিশ 'দালালদের পাণ্ডা' আখ্যা দিয়ে তাঁর 'টিকি ধরে টান দেওয়ার' আহ্বান জানায়, আর ভোটপর্ব শেষের মুখে 'ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা' বলে ডাকছেড়ে 'সিপিএম, তৃণমূল, নকশাল, অবেজেপি' সবাইকে নিয়ে 'বাঙ্গালিকে এককাট্টা' করতে চায়, তখন এদের কুমতলব ধরতে আর কারুর বাকি থাকে না। এরা বুঝে গিয়েছে সিপিএম কোমায়, আর বাঁচবে না। তাই এদের জীবনরক্ষার সেরা আশ্রয় মমতা ব্যানার্জির দল, যারা প্রতিনিয়ত ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ভাঙতে চায়, ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্বকে বিপন্ন করতে চায়।

সিপিএমও এই চরিত্রের হলেও তাদের একটা ঢাকঢাক-গুড়গুড় ব্যাপার ছিল। তৃণমূলের সেই বলাটুকুও নেই। তৃণমূলের অগণতান্ত্রিক নীতির মধ্যেই আরবান নকশালরা তাদের 'আদর্শগত' মিল খুঁজে পেয়েছে। তাই তৃণমূলি অপকর্ম ঢাকতে খড়্গহাতে থুড়ি কলম হাতে এরা সবার প্রথমে রাস্তায় নেমে পড়ে। অনিবার্যভাবে এসে যায় হিন্দু- মুসলমান, বাঙ্গালি-অবাঙ্গালিতত্ত্ব। মুখোশের আড়ালে প্রকৃত মুখ হলো— বাঙ্গালিকে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং ইসলামি সংস্কৃতিকে বাঙ্গালি সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম করে দেখানো। ফল? বুঝতেই পারছেন '৪৬-৪৭-এর ভয়াবহ দিনগুলি উঁকি মারছে তো? মাথায় রাখবেন এখন কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো কোনও 'বাঙ্গালি' ব্যক্তিত্ব নেই।

কোনওকালেই নকশাল-মাওবাদী-বামপন্থীরা বিদ্যাসাগরকে দেখতে পারতো না। এদের ভোলবদল দেখলে গিরগিটিও লজ্জা পাবে। এরা চিরকাল দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী। ফ্যাসিস্ট ইতালি নাৎসী জার্মানিকে রুখতে ব্রিটিশরা ছিল এদের বন্ধু। তাই গান্ধীজীর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল এরা। বিদ্যাসাগর কেন ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় গোরাসৈন্যদের সংস্কৃত কলেজ ছাউনি ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন এই অজুহাতে বিদ্যাসাগর এদের কাছে বুর্জোয়া, সাম্রাজ্যবাদের দালাল। আজ তৃণমূলি দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য এদের বিদ্যাসাগর প্রেমিক করে তুলেছে, যেমন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও গান্ধীবাদের চূড়ান্ত বিরোধীরা গান্ধীপ্রেমী হয়ে উঠেছিল। সুতরাং সাধু সাবধান।

কলেজের বাইরে থেকে গিয়ে মূর্তি ভাঙা সম্ভব নয়

সুকল্যাণ রায়

বিদ্যাসাগর কলেজের মূর্তি ভাঙার ঘটনা বিশ্লেষণ করতে হলে কলেজের অবস্থানগত চিত্রটি আগে পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে। কলেজটির দুটি প্রবেশ পথ, একটি শঙ্কর ঘোষ লেনে, দ্বিতীয়টি বিধান সরণির উপর। প্রথমটি মেন ক্যাম্পাস হিসেবে পরিচিত এবং দ্বিতীয়টি হস্টেল ক্যাম্পাস। বিধান সরণির এই ক্যাম্পাসের পাশেই রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' হস্টেল। এই দুই ক্যাম্পাসই পিছনের দিক থেকে সংযুক্ত বা এরকমও বলা যেতে পারে কলেজ বিল্ডিংটি শঙ্কর ঘোষ লেনে শুরু হয়ে বিধান সরণিতে এসে শেষ হয়েছে। গত ১৪ মে মূর্তি ভাঙার যে লজ্জাজনক ঘটনাটি ঘটেছে সেটি কলেজের বিধান সরণি ক্যাম্পাসে। ঘটনার পর তৃণমূল ও বিজেপি পরস্পরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। আমরা সেই দিকে না গিয়ে কিছু সম্ভবনা নিয়ে আলোচনা করব।

বিদ্যাসাগর কলেজের বিধান সরণি ক্যাম্পাসে ঢুকতে হলে প্রথমে একটি লোহার গেট পেরোতে হয়। সেখানে সামনের বাকি জায়গাটা লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। এই লোহার গেটটি সাধারণত বন্ধই থাকে। কেবলমাত্র শিক্ষক ও কলেজের অন্য কর্মীদেরই কলেজে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় এই গেট দিয়ে। ছাত্র-ছাত্রীদের ঢোকার জন্য ব্যবহার হয় শঙ্কর ঘোষ লেনের গেট। বিধান সরণি ক্যাম্পাসের লোহার গেটটি পেরোলেই কলেজ বিল্ডিং। বিল্ডিংয়ের সামনের দিকে তিনটি কাঠের দরজা (ছবি দেখলে বোঝা যাবে)। যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা হয় মাঝের দরজাটি, যেখানে কাঠের পাল্লার পাশাপাশি লোহার কোলাপসিবল রয়েছে। বাকি দুটি দরজা বন্ধ থাকে, কস্মিনকালেও খোলা হয় না। সেই মাঝের দরজা দিয়ে কলেজ বিল্ডিংয়ে ঢুকলে একটা বড়ো ঘরে ডানদিকে বিদ্যাসাগরের আবক্ষ সাদা মূর্তি ডেক্সের উপর কাঁচের ঘেরাটোপে রয়েছে।

ঘটনার পরের দিন যে ভিডিয়োগুলি সামনে এসেছে তাতে একটিতে দেখা যাচ্ছে বিল্ডিংয়ের বাইরে রেলিং দিয়ে ঘেরা জায়গায় দুষ্কৃতীরা মূর্তির কিছু অংশ মাটিতে আছড়ে ভাঙছে। সেই সময় মাঝের যাতায়াতের মূল দরজাটি কিন্তু বন্ধ ছিল, এবং আশ্চর্যজনকভাবে খোলা রয়েছে পাশের একটি দরজা। যেটি সব সময় বন্ধ থাকে এবং তা কোনওভাবেই খোলা থাকার কথা নয়। এবার প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি ভেতর থেকেই দরজাটি খোলা হয়েছে? কারণ, সামনের দরজা ছাড়াও ওই বিল্ডিংয়ে ঢোকা যায় একেবারে পিছনের লাইব্রেরি দিয়ে। বাইরে থেকে গিয়ে কারো পক্ষে সেখান দিয়ে বিল্ডিংয়ে ঢোকা সম্ভব নয়। কারণ গোলকধাঁধাঁময় এই প্রাচীন কলেজে ছাত্ররাই অনেক সময় পরীক্ষার হল খুঁজতে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তৃণমূল কংগ্রেসের দেখানো ভিডিয়ো ফুটেজ অনুযায়ী যদি ধরেও নেওয়া যায় যে বহিরাগতরা বাইরের লোহার গেট ভেঙে কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকেছে তাহলেও কিন্তু তাদের পক্ষে বিল্ডিয়ের ভিতরে ঢুকে বিদ্যাসাগরের মূর্তি পর্যন্ত পৌঁছানো কোনো ভাবেই সম্ভব নয়।

এবার আসি অন্য কিছু প্রসঙ্গে। সংবাদমাধ্যমের সেই মুহূর্তের খবর অনুযায়ী বিজেপির শান্তিপূর্ণ মিছিলে প্রথমে কলেজের ভিতর থেকেই ইট, বোতল ছোঁড়া হয়। এখন প্রশ্ন হলো, রাজনীতির লাভ তোলার জন্য কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করা সঙ্গত? বিজেপির মতো একটি সর্বভারতীয় সংগঠনের সভাপতির রোড শো'তে কালো পতাকা কেউ দেখাতেই পারে, কিন্তু ইট-পাটকেল নিয়ে আক্রমণ কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, বিদ্যাসাগর কলেজের সান্ধ্যকালীন পঠনপাঠন হয় শঙ্কর ঘোষ লেনের ক্যাম্পাসে। তাহলে সন্ধ্যে



সাতটার পরও বিধান সরণি ক্যাম্পাসে কারা ছিল? বিকেল পাঁচটায় কলেজ ছুটি হওয়ার পরেও অনেক সময় শিক্ষক-শিক্ষিকারা থেকে যান। কিন্তু তাঁরা নিশ্চয় মিছিলকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল ছোঁড়েননি। এর সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে আরেকটি প্রশ্ন, কলেজ বিল্ডিংয়ের গায়েই গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা। শিক্ষক-শিক্ষিকারা কলেজে থাকলে সেখানে নিশ্চয় তাঁদের গাড়িও ছিল। তাহলে গাড়ি ভাঙচুরের কোনো ঘটনা এখনও সামনে এলো না কেন? বাইরের আক্রমণকারীদের সহজ লক্ষ্য হতে পারত সেই গাড়িগুলি। ঘটনার পরেই বহু বিজেপি কর্মী আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বিজেপিই যদি আক্রমণকারী হয় তাহলে তৃণমূলের কেউ আহত হলো না কেন? তৃণমূল ছাত্র পরিষদের যে ছাত্রদের আহত বলে দেখানো হয়েছে তাদের মধ্যে তৃণমূল ছাত্রনেতা তীর্থপ্রতীম সাহা ইতিমধ্যে স্বীকার করে নিয়েছেন তাঁর হাতে চোট লেগেছিল চার দিন আগে। অভিষেক মিশ্র নামে আরও এক প্রাক্তন ছাত্র তাঁর স্ত্রী স্বর্ণালী-সহ আহত হওয়ার যে দাবি করেছেন তাদের কথার মধ্যেও অসঙ্গতি রয়েছে। অভিষেক মিশ্র ও স্বর্ণালী দাবি করেছেন তাঁরা কলেজে মার্কশিট তুলতে এসেছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য হলো কলেজের নিয়ম বেলা তিনটের পর থেকে অফিস ছুটির আগে পর্যন্ত প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সার্টিফিকেট, মার্কশিট দেওয়া হয়। তাহলে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত তারা কলেজে কী করছিলেন?

কলেজের অনেক শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী দাবি করেছেন যে, বহিরাগতরাই মূর্তি ভেঙেছে। কিন্তু তাঁদের বয়ান ও সেখানকার বাস্তবতার মধ্যে বিস্তর ফারাক। যে ঘরে বিদ্যাসাগরের মূর্তি রয়েছে সেই ঘরের সঙ্গে বাকি ঘরের যোগ লম্বা একটা করিডোরের মাধ্যমে। অর্থাৎ সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে ঘরে কী হচ্ছে তা কোনো ভাবেই দেখা সম্ভব নয়। তাঁদের দাবি গণ্ডগোল শুরু হতেই তাঁরা সিড়ি দিয়ে উপরে পালিয়ে যান। একই দাবি করেছেন কেয়ারটেকারও। তাহলে মূর্তি কে ভাঙলো তা তাঁরা দেখলেন কীভাবে? প্রথম যে ভিডিয়োটি প্রকাশ হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন ভাঙা মূর্তির কিছু অংশ বিল্ডিংয়ের বাইরে এনে আছড় মারছে। এখানে প্রশ্ন হলো, যে ঘরে মূর্তি থাকে সেই ঘরটি যথেষ্ট বড়ো, বাইরের লোকেদের ভিতরে ঢুকে মূর্তি ভাঙাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহলে তারা সেই কাজটি ভেতরেই করতে পারত, বাইরে কেন? সেই ভিডিয়োতেই আরও একজন বিতর্কিত চরিত্র আবির্ভাব হয়েছে। হলুদ পঞ্জাবি পরিহিত এক যুবক। ঘটনার সময় সেই যুবককে ভাঙচুর করতে দেখা গেছে, আবার পরে তাকেই দেখা গেছে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে। সেই যুবক কে?

এত প্রশ্ন, ঘটনার মধ্যে এত অসঙ্গতি পুরো ব্যাপারটাকেই একরকম ধোঁয়াশায় পরিণত করেছে। এখন সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন ওই ঘরে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজ এখনও প্রকাশ হচ্ছে না কেন? তাহলে কী দোষীদের আড়াল করা হচ্ছে? বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন রকমের যুক্তি দেওয়া হচ্ছে, তবে এখনও পর্যন্ত একটি বিষয় নিশ্চিত বাইরে থেকে গিয়ে কারো পক্ষে কলেজের ভিতরে ঢুকে মূর্তি ভাঙা কোনও ভাবেই সম্ভব নয়।



বিদ্যাসাগর কলেজের বিধান সরণী ক্যাম্পাস।



বিদ্যাসাগরের মূর্তি (ভাঙার আগে)।

“সবচেয়ে বড়ো প্রশ্ন ওই ঘরে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও ঘটনার ভিডিয়ো ফুটেজ এখনও প্রকাশ হচ্ছে না কেন? তাহলে কী দোষীদের আড়াল করা হচ্ছে? বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন রকমের যুক্তি দেওয়া হচ্ছে, তবে এখনও পর্যন্ত একটি বিষয় নিশ্চিত বাইরে থেকে গিয়ে কারো পক্ষে কলেজের ভিতরে ঢুকে মূর্তি ভাঙা কোনও ভাবেই সম্ভব নয়।”

ফিরে আসছে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাঙ্গালি হিন্দু জাতীয়তাবোধ

জ্যোতি প্রকাশ চ্যাটার্জি

১৯২৫ সালে বার্মার মান্দালয় জেলে বন্দি থাকাকালীন জেল কর্তৃপক্ষ জেলের ভিতরে দুর্গাপূজার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করলে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু জেলের মধ্যেই অনশনে বসেন এবং অবশেষে তার অদম্য প্রচেষ্টার পর জেলকর্তৃপক্ষ বিধিনিষেধ তুলে নিতে বাধ্য হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জানতেন যে ভারতবর্ষকে ঐক্যর বন্ধনে বাঁধার জন্য তার সংস্কৃতি এবং প্রাচীন ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত আবশ্যিক।

শুধু নেতাজীই নয়, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের আর এক সেনাপতি অরবিন্দ ঘোষ যিনি তার বিখ্যাত উত্তরপাড়া অভিভাষণে বলেন ভারতবর্ষের জাতীয়তা বা Nationalism হলো সনাতন ধর্ম। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, যে ধর্মের ভিতরে সহনশীলতা সর্বাধিক সেই ধর্মই হলো ভারতের জাতীয়তা।

এই জাতীয়তাবোধের ধারণা আমরা স্বামী বিবেকানন্দের ভিতরেও পাই। তিনি বলেছিলেন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য এবং পরম্পরা ও সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি অসম্ভব। তাই তিনি ভারতবর্ষকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তো আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তার বিখ্যাত আনন্দমঠ উপন্যাসে 'ত্বং হি দুর্গা' বলে উল্লেখ করেছেন।

বাঙ্গালি মনীষীদের চিন্তাধারা এবং আদর্শকে বাস্তবের রূপ দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। ১৯৪৬ সালের হিন্দু নরসংহারের পর যখন ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মোটামুটি ভাবে নিশ্চিত হয়ে যায় তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে বঙ্গীয় আইনসভায় অবিভক্ত বাঙ্গলার হিন্দু প্রতিনিধিদের ভোটাভুটির ফলে পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্য তৈরি হয়। পরবর্তীতে দেশভাগের পর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি clean exchange of population বা জনসংখ্যার বিনিময়ের পক্ষে জোরদার আওয়াজ তোলেন। জনসংখ্যার বিনিময় বলতে তিনি পাকিস্তানের হিন্দুদের ভারতে নিয়ে আসতে বলেছিলেন। তাঁর দূরদর্শিতা কতটুকু সেটা আজ বাংলাদেশের বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের করুণ পরিণতি এবং ক্রমহ্রাসের প্রবণতা দেখলে বোঝা যায়।



শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতীয় জনসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁর ভারতীয় জনসঙ্ঘ দলটির প্রতিষ্ঠার কারণ ছিল বাঙ্গালি হিন্দুদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান নিশ্চিত করা এবং ভারতীয় মূল ধারা থেকে যাতে বাঙ্গালি হিন্দু সমাজ বিচ্ছিন্ন না হয় সেটি নিশ্চিত করা। কিন্তু দুঃখজনকভাবে দেশভাগের ৭২ বছর পর বাঙ্গলাকে আজ মা দুর্গার বিসর্জনের জন্য আদালতের কড়া নাড়তে হচ্ছে। ক্রমাগত ঘটে চলেছে ধুলাগড়, কালিয়াচক, বসিরহাট, দেগঙ্গা, নলিয়াখালির মতো ঘটনা যার ফলে হিন্দু সমাজ আজ বিপন্ন এবং অসহায়।

সেইজন্য এইবারের নির্বাচন বাঙ্গলার জন্য ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। বাঙ্গলার ৪২ জন বিজেপি প্রার্থীর কাছে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো নেতাজী, ঋষি অরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, বিবেকানন্দের স্বপ্ন এবং আদর্শকে বাঙ্গলার বুকে পুনঃস্থাপন করা। আর একথা ভুললে চলবে না বাঙ্গলাকে বাদ দিয়ে যেমন ভারতবর্ষকে কল্পনা করা যায় না তেমনিভাবে স্বামীজীর মতে ভারতবর্ষের মৃত্যু মানে সত্যের নিশ্চিত মৃত্যু ঘটা। ■

"বাঙ্গলাকে বাদ দিয়ে যেমন ভারতবর্ষকে কল্পনা করা যায় না, তেমনিভাবে স্বামীজীর মতে ভারতবর্ষের মৃত্যু মানে সত্যের নিশ্চিত মৃত্যু ঘটা।"



বিশ্বের আদি সংবাদিক নারদ

ওম প্রকাশ সিংহ

আদি সাংবাদিক নারদের বিভিন্ন উপনাম আছে, কিন্তু এই উপনামগুলির সঙ্গে কোনও না কোনও ইতিহাস জড়িয়ে আছে। এখানে আমি আদি সাংবাদিক দেবর্ষি নারদের একটি এরূপ উপনামের আলোচনা করব, যার অর্থ হলো সঞ্চারক, সংবাদদাতা, সাংবাদিক। এর উল্লেখ কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' কয়েকবার এসেছে। এর অতিরিক্ত সংস্কৃতের শব্দকোষেও 'আচার্য পিশুনঃ'-এর অর্থ দেবর্ষি নারদের নামে চিহ্নিত আছে। সংস্কৃত শব্দকোষে 'পিশুন' শব্দের অর্থ সংবাদ দানকারী, সঞ্চারক, সংবাদ প্রেরণকারী, সংবাদ সংবাহক। আচার্য শব্দের অর্থ গুরু, শিক্ষক, যজ্ঞের মুখ্য সঞ্চালক, বিদ্বান ইত্যাদি। এই দুটি শব্দের অর্থ হলো সংবাদদাতা এবং বিজ্ঞ পুরুষ। আচার্য পিশুন সংস্কৃত সাহিত্যে যাঁকে বলা হয়, তিনি হলেন দেবর্ষি নারদ। সংস্কৃত সাহিত্যে দেবর্ষি নারদের জন্য উল্লিখিত 'আচার্য পিশুনঃ' থেকে স্পষ্ট হয় যে দেবর্ষি নারদ তিনলোকে সমাচার প্রেরকরূপে বিখ্যাত ছিলেন।

পুরাণ অনুসারে ব্রহ্মার আদেশে তাঁর পুত্র 'দক্ষ' শত পুত্রের জন্ম দান করেন এবং ওই পুত্রদিগকে সৃষ্টি বৃদ্ধির জন্য আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু ব্রহ্মার মানসপুত্র ও দক্ষের ভাই নারদ দক্ষের পুত্রগণকে সৃষ্টি করা থেকে বিরত করে তপস্যায় নিয়োজিত করে দেন। দক্ষ পুনরায় তাদের পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে সৃষ্টি কর্মে নিয়োজিত হওয়ার আদেশ করেন কিন্তু তখনও নারদ তাদের পুত্র সৃষ্টি করা থেকে বিরত করে নারদ তপস্যা কর্মে নিয়োগ করেন। এতে ক্রোধান্বিত হয়ে দক্ষ নারদকে তিনটি অভিশাপ প্রদান করেন যে— সে সর্বদা বিচরণ করবে, কোথাও অধিক সময় অবস্থান করবে না এবং এক স্থানের সংবাদ অন্য স্থানে প্রেরণ করবে। দেবর্ষি নারদ দক্ষের এই তিন অভিশাপকে লোকহিতে স্বীকার করে নেন। এই প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, যদিও দেবর্ষি নারদ এতটাই সক্ষম ছিলেন যে খবর আদান-প্রদান করার সঙ্গে সঙ্গে নারদ পুরাণ, নারদ স্মৃতি, নারদীয় জ্যোতিষ ইত্যাদি গ্রন্থের রচনা করেছিলেন। 'বীণা' নামক বাদ্যযন্ত্রের তিনি আবিষ্কারক ছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রের তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। নারদের মতানুসারে সংবাদের মূল হলো বক্তা, শ্রোতা এবং কথন। এই সূত্রগুলিই হলো সাংবাদিকতার প্রধান উপাদান। কিছু লোকের মনে এই প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে যে, নারদ আদি সাংবাদিক



কীভাবে হলেন? এই প্রকার প্রশ্নকর্তার মনে সমাচার পত্র-পত্রিকা, রেডিয়ো এবং টেলিভিশনের সংবাদ সম্পর্কিত সময়কালের কথাই মনে জাগে। এই কারণেই এদের মনে এরূপ প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে ওঠে আসে। কিন্তু যখন সাংবাদিকতার ব্যবহার আদিকাল থেকে বিচার করা হবে তখন তাদের ভ্রম স্বাভাবিকভাবেই সমাপ্ত হবে। দেবর্ষি নারদ বাস্তবে আদি সাংবাদিক ছিলেন। কারণ তিনি সাংবাদিকের কাজই করতেন। সাংবাদিকতা বাস্তবে সংবাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কাজ। বর্তমানে সাংবাদিকরা সংবাদ সংগ্রহ ও সংবাদ সম্পাদন করে থাকেন। আদি সাংবাদিক নারদও তিনলোকে সংবাদ প্রেরণের কাজ করতেন। এই কারণে নিশ্চিতভাবেই তাঁকে সাংবাদিক বলা যেতে পারে।

নারদের সাংবাদিকতা শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের বিনাশের উদ্দেশ্যেই ছিল। সমুদ্র মন্থনে বিষ নির্গমনের সংবাদ সর্বপ্রথম নারদ মুনি মন্থনে নিযুক্ত দু'পক্ষকে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সংবাদে গুরুত্ব না দেওয়ায় বিষ নির্গত হয়েছিল। সতীর দক্ষের যজ্ঞকুণ্ডে দেহত্যাগের সংবাদ নারদ সর্বপ্রথম ভগবান শিবকে প্রেরণ করেন। মহাভারতের যুদ্ধের সময় তীর্থ ভ্রমণে রত বলরামকে মহাভারতের যুদ্ধের সমাপ্তি সংবাদ নারদই দিয়েছিলেন। নারদ এক সাংবাদিক রূপে জগন্নাথের রথযাত্রার প্রারম্ভ করিয়েছিলেন। শুধু এটুকুই নয় সাংবাদিক রূপে কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, গয়া, বদ্রিকাশ্রম, কেদারনাথ, রামেশ্বরম-সহ সকল তীর্থের সীমা ও মহত্ত্বের বর্ণনা নারদ পুরাণে আছে। শুধু এরূপই নয় সকল উৎসব এবং পর্বগুলির বর্ণনাও তিনি করেছেন। তিনি নারদ পুরাণে সকল পুরাণের সমীক্ষা প্রস্তুত করেছেন। পুরাণ সমীক্ষা বর্তমানে পুস্তক

সমীক্ষার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। নারদ প্রশ্নোত্তর সংবলিত পুস্তকের পরম্পরা আরম্ভ করেন। এর উল্লেখ পুরাণে বর্তমান।

নারদ মুনি বর্তমান সাংবাদিকদের জন্য যে সমস্ত রচনা রেখে গেছেন এই সমস্ত বিষয়ে অধ্যয়ন আবশ্যক। তিনি মায়ার বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য একবার স্ত্রী রূপ ধারণ করেন। এটা তাঁর অনুভাবাত্মক সাংবাদিকতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তিনি মৃত্যু নিয়েও জীবনবৃত রচনা করেন, যা বিশ্বে অন্যত্র কোথাও নেই। কলিযুগে ধর্মের রক্ষা এবং সদাচরণের জন্য শ্রী সত্যনারায়ণ ব্রতের প্রচলন ও বিস্তার করেছিলেন। মহর্ষি বাল্মীকিকে রামায়ণ রচনায় তিনি উদ্বুদ্ধ করেন। মহাভারত রচনার পর তিনি বেদব্যাসকে শান্তি ও সন্তোষের জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করার উদ্দেশে অনুপ্রাণিত করেন। এই প্রেরণার পরিণাম স্বরূপ বেদব্যাস 'শ্রীমদভাগবত' রচনা করেন। এই সময়কালে নারদমুনি 'ইন্দ্রপ্রস্থ'-এর নামকরণ এবং 'কুরুক্ষেত্রে'র নামকরণ এবং ইতিহাস বর্ণন করেন।

দেবর্ষি নারদের সাংবাদিকতা আধ্যাত্মিকতার ওপর অধিষ্ঠিত ছিল। তিনি স্বার্থ, লোভ এবং মায়ামোহ থেকে পরমার্থকে শ্রেয় মনে করতেন। তিনি ভক্ত ধ্রুবকে তপস্যা ও ঈশ্বর প্রাপ্তির পথপ্রদর্শন করান। শুধু এরূপই নয়, প্রহ্লাদকেও ভক্তি এবং অধ্যাত্মের উপদেশ প্রদান করে অসুরশক্তির বিনাশে সহযোগিতা করেন। স্কন্দপুরাণে উল্লিখিত সংগ্রহ অনুসারে একবার অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেন, ''আপনি কেন প্রতিদিন নারদ নামের জয়ধ্বনি করেন?'' এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেন, ''ত্রিভুবনে দেবর্ষি নারদের থেকে শ্রেষ্ঠ আর অন্য কেউ নেই। নারদ নিজের জন্য নয়, ত্রিলোকের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন। তাঁর এই প্রকার লোক কল্যাণকারী ব্যবহারের জন্য আমি প্রতিদিন নারদ নামের জপ করে থাকি।'' নারদের বিষয়ে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা উপদেশ প্রদান করেন। তিনি গীতায় বলেছেন, 'দেবর্ষিদের মধ্যে নারদ আমি।' সেজন্য নারদ শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং তাঁর প্রিয় পাত্র ছিলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সঙ্গে সহ সব দেবতার কাছে যাতায়াত বা খবরাখবর প্রদান নারদের সহজ ব্যবহারের অংশ ছিল। ব্রহ্মার মানসপুত্র হওয়ার কারণে নারদ সৃষ্টির আরম্ভ থেকেই বিরাজমান। তিনি সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত দেবরক্ষক এবং অসুর বিনাশক রূপে বিদ্যমান থাকবেন।

দেবর্ষি নারদ মানব সৃষ্টির প্রারম্ভেই সাংবাদিকতার যে আদর্শ এবং স্বরূপ প্রস্তুত করেন, তার ওপর স্বতন্ত্র অধ্যয়ন প্রয়োজন। তিনি চরম বিপত্তি থেকে মানবতাকে রক্ষা করার কাজে নিয়োজিত। এক সময় যখন অর্জুন দিব্যাস্ত্রের পরীক্ষা করতে সচেষ্ট হন, তখন নারদ অর্জুনকে তা করতে বারণ করেন। তিনি অর্জুনকে বুঝিয়ে বলেন, 'দিব্যাস্ত্র পরীক্ষা বা প্রয়োগের বস্তু নয়। এর ব্যবহার আসুরী শক্তি থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করার জন্যই করা যেতে পারে। দেবর্ষি নারদের সাংবাদিকতা শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম।

(লেখক মহামনা মালবীয় পত্রকারিতা সংস্থান, মহাত্মা গান্ধী কাশী বিদ্যাপীঠ, বারাণসীর নির্দেশক।)

যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের উপদেশ

ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদের জন্য নতুন রাজধানী স্থাপিত হয়। ময়দানব রাজধানীর সভাগৃহ উত্তমরূপে সাজিয়ে দেন। নতুন রাজধানীতে অবস্থান কালে পঞ্চপাণ্ডব সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধাসহ সুখে দিন যাপন করতে থাকেন। এরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একদিন দেবর্ষি নারদ ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডব সভায় উপনীত হন। কুশল বিনিময়ের পর দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান করেন। কাশীদাসী মহাভারতে তা বর্ণিত রয়েছে :

তহে মুনি স্নেহবশে, জিজ্ঞাসেন মৃদুভাষে,
কহ রাজা, ভদ্র আপনার।
কুলের কৌলিক কর্ম্ম, ধন-উপার্জন-ধর্ম্ম,
নির্ব্বিঘ্নেতে হয় কি তোমার।।
সাধু-বিজ্ঞ যতজন, অনুরক্ত মন্ত্রিগণ,
এ-সবার রাখ কি বচন।
মন্ত্রণা অনেক সহ, একক ত না করহ,
কার্য্যে কি রাখহ মুখ্যগণ।।
ভক্ষ্যদ্রব্য যথাযথ, ন্যায় মূল্যে কিন তত,
না রাখহ দ্বিজের দক্ষিণা।
তবে অনুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত,
দুঃখ তো না পায় কোনও জনা।।
বিজ্ঞযোগ্যপুরোহিত, দৈবজ্ঞজ্যোতিষবিদ্,
আছে কিবা বৈদ্য, চিকিৎসক।
অনাথ অতিথি লোকে, অনল ব্রাহ্মণ-মুখে,
সদা দেহ ঘৃত-অন্নোদক।।
রাজ্যের যতেক রাজা, যায় যথোচিত পূজা,
সবে অনুগত তো তোমার।
ধান্য ধন বহুমত, উদক আয়ুধ যত,
পূর্ণ করিয়াছ তো ভাণ্ডার।।
প্রাতঃকালে নিদ্রাবশ, বৈকালেতে ক্রীড়ারস,
আলস্য-ইন্দ্রিয় নিবারণ।
ধর্ম্ম কর্ম্মে ধনব্যয়, কর নিত্য উপচয়,
পুত্রবৎ পাল প্রজাগণ।।

এরূপ ভাবে বহু নীতিকথা পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মা-নন্দন নারদ ধর্মরাজকে প্রদান করলেন। পরিশেষে দেবর্ষি রাজা যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানের উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে তাঁদের স্বর্গবাসী পিতা পাণ্ডুর সঙ্গে তাঁর যমালয়ে সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন পাণ্ডু তাঁর নিকট রাজসূয় যজ্ঞের বার্তা পুত্রদের সমীপে প্রেরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আদর্শ সাংবাদিকের ন্যায় তিনি সেই কর্ম সম্পাদন করেন এবং তৎসহ ন্যায় সঙ্গত উপদেশ প্রদান করেন, যাহা একজন প্রকৃত সাংবাদিকের কর্তব্য।



সংস্কৃত-সাহিত্যের এক বিশেষধারা—চম্পূকাব্য

অমিত ঘোষ দস্তিদার

সংস্কৃত-সাহিত্যের যে মহাসমুদ্রাকার বিস্তৃতি তা মহাকাব্য, দৃশ্যকাব্য, শ্রাব্যকাব্য, খণ্ডকাব্য, গদকাব্য প্রভৃতি ধারার মিলিত রূপের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। চম্পূকাব্য এই রকমই এক বিশেষ ধারা। সংস্কৃত-সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধিতে চম্পূকাব্যের অবদান অনস্বীকার্য।

সংস্কৃত-সাহিত্যের সূচনা যেমন রহস্যাবৃত, সুদূর অতীত থেকে সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতভূমিতে তা স্বয়ং উদ্ভূত হয়ে উঠেছিল। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যখন জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখার অভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে গহন তমিস্রায় আচ্ছন্ন, সেই সময় থেকে আজও সংস্কৃত-সাহিত্য ভারতবর্ষে মহীয়ানরূপে তার জ্ঞানগরিমার আলো ছড়িয়ে চলেছে। সম্ভবত সেই কারণেই সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে সংস্কৃত-সাহিত্যি গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত।

'চম্পূ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো চমৎকৃত কার্যরূপের মাধ্যমে প্রসন্ন করে তোলা। মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ 'চম্পূ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন— ''চমৎকৃত্য পুনাতি সহৃদয়ান্ বিস্মিতীকৃত্য প্রসাদয়তীতি চম্পূরিতি'' (সাহিত্য-দর্পণ, ৬/৩১২ সংখ্যক কারিকার 'কুসুমপ্রতিমা' টীকা)। যা সহৃদয় সামাজিককে চমৎকৃত করে তাঁদের প্রসন্ন করে তাকে বলা হয় চম্পূ। আচার্য দণ্ডী বলেছেন— ''গদ্যপদ্যময়ী কাচিৎ চম্পূরিত্যভিধীয়তে'' (সা.দ-৬/৩১২)। —গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত কাব্যই চম্পূপদবাচ্য। পণ্ডিত রঙ্গাচার্যশাস্ত্রী বলেছেন— ''অত্র পদ্যপ্রাচুর্যং গদ্যসমকক্ষতয়া অপেক্ষতে'' (কাব্যাদর্শ— 'প্রভা' টীকা)। অর্থাৎ চম্পূকাব্যে গদ্য ও পদ্যের অনুপাত হবে সমান। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত চম্পূকাব্যের রচনাধারা তেমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি। এর আগে বেদের আখ্যানভাগে, মহাভারত ও পুরাণে, পালি জাতক সমূহে, সংস্কৃত-গল্প-সাহিত্যে গদ্যের মাঝে মাঝে পদ্যের ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু তখন চম্পূকাব্যের ধারণা গড়ে ওঠেনি। পুরোপুরিভাবে যখন থেকে সংস্কৃত গদ্যরচনা শুরু হলো তারপর থেকেই গতানুগতিক একঘেয়েমি থেকে মুক্ত করে রচনার মধ্যে বৈচিত্র্যের স্বাদ নিয়ে আসার জন্যই এই নতুন কাব্যধারার সৃষ্টি হয়েছে।

জৈনধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের ক্ষেত্রে একাধিক চম্পূকাব্য রচিত হয়েছে। ভক্তিবাদ, বিশেষ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে যেমন চম্পূকাব্য চরিত হয়েছে, তেমনি ভাগবত অবলম্বনেও চম্পূকাব্য রচিত হয়েছে। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রের সভাকবি ও দেবাদিত্য-পুত্র ত্রিবিক্রমভট্ট বা সিংহাদিত্য রচিত নল-দময়ন্তী কথা অবলম্বনে রচিত 'নলচম্পূ'-ই হলো সর্বাপেক্ষা প্রাচীন চম্পূকাব্য। অনেক সংস্কৃত-সাহিত্য-বিশেষজ্ঞের অনুমান, 'মদালসাচম্পূ'-র রচয়িতাও ত্রিবিক্রমভট্ট। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে চালুক্য বংশীয় রাজা তৃতীয় অরিকেশরীর পৃষ্ঠপোষকতায় দিগম্বর জৈন সোমপ্রভাসূরি রচিত 'যশস্তিলকচম্পূ' অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য চম্পূকাব্য। গুণভদ্রের উত্তরপুরাণ অবলম্বনে রচিত হরিচন্দ্রের 'জীবন্ধরচম্পূ'ও অন্যতম একটি চম্পূকাব্য। পরমার রাজবংশীয় ধারাধিপতি ভোজরাজ (১০১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০৬৩ খ্রিস্টাব্দ) রচিত 'রামায়ণচম্পূ' সংস্কৃত-চম্পূকাব্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

খ্রিস্ট্রীয় সপ্তদশ শতকে মহাভারতের বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে অনন্তভট্ট 'ভারতচম্পূ' রচনা করেন। ওই একই সময়ে কবি নারায়ণ রচনা করেন 'স্বাহাসুধাকরচম্পূ'। শঙ্কর রচিত 'শঙ্করচেতোবিলাসচম্পূ', নীলকণ্ঠ দীক্ষিত রচিত 'নীলকণ্ঠবিজয়চম্পূ', কেশবভট্টের 'নৃসিংহচম্পূ', শেষকৃষ্ণের 'পারিজাতহরণচম্পূ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা সংস্কৃত চম্পূকাব্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

সংস্কৃত চম্পূকাব্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব সাধকদের অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণবভাবধারায় অনুপ্রাণিত শ্রীচৈতন্যের শিষ্য রঘুনাথ দাস রচিত 'মুক্তাচরিত' চম্পূকাব্যরূপে প্রসিদ্ধ। জীব গোস্বামীর 'গোপালচম্পূ' কবিকর্ণপুরের 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ' চম্পূকাব্যরূপে ও বৈষ্ণবদর্শনরূপে বিশেষ সমাদৃত। গুরুত্বের বিচারে চম্পূকাব্য ধারা সংস্কৃত-সাহিত্যের কে অসামান্য সম্পদ হিসাবে অবদান রেখেছে।

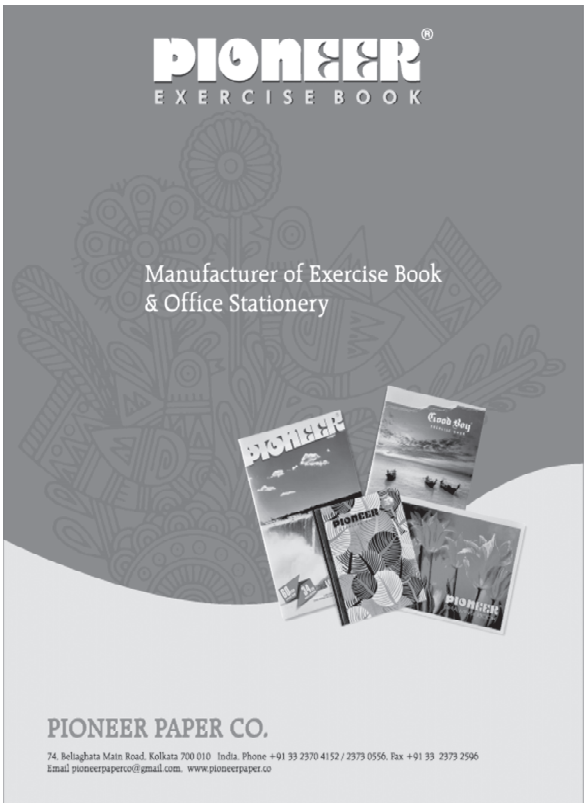
'রামায়ণচম্পূ'-র বালকাণ্ডে (১/৩) চম্পূকাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভোজরাজ বলেছেন— ''গদ্যানুবন্ধরস-মিশ্রিত পদ্যসূক্তির্হৃদ্যা হি বাদ্যকলয়া কলিতের গীতিঃ''। বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গীত সঙ্গীতের ন্যায় গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে রচিত চম্পূকাব্যও সহৃদয়ের চিত্তকে রসসিক্ত করে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

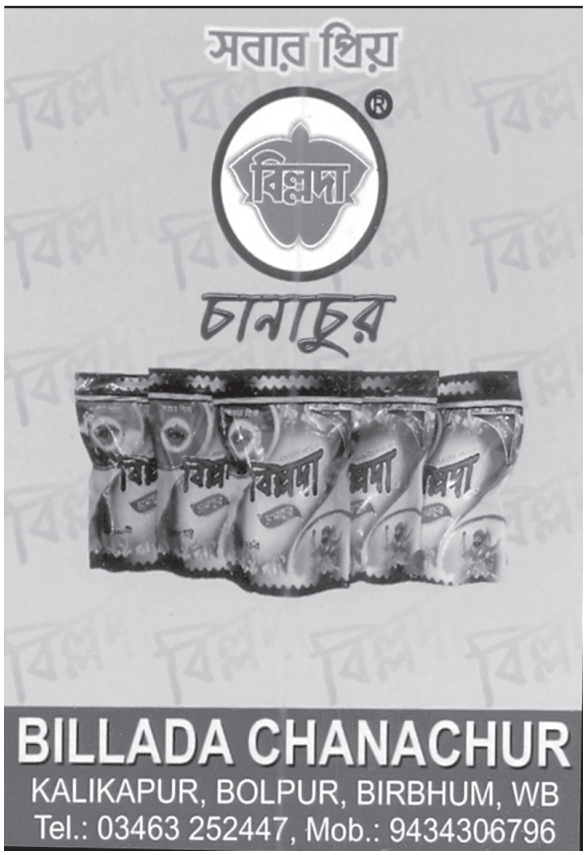
১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩



বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫





হারিয়ে পাওয়া

কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওড়ায় শিবপুরে কৈলাস লাহিড়ী লেনের তিন নম্বর বাড়ি 'উমাপতি নিবাস' হলো খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাড়ি। লাল রঙের দোতলা দক্ষিণ খোলা বাড়িটার এক তলা পুরানো আমলে তৈরি। দোতলা পরে সংযোজিত হয়েছে। বাড়ির পিছনে এক ফালি জমিতে একটা আম আর একটা কাঁঠাল গাছ রয়েছে। বাড়ির সামনে টানা রোয়াক। জানলাগুলি শার্সি খড়খড়ি দেওয়া। এই বাড়ি খগেনবাবুর পিতা তৈরি করে তস্য পিতা অর্থাৎ খগেনবাবুর দাদু উমাপতিবাবুর নামে নামকরণ করেন।

এখন পড়ন্ত বিকাল। সূর্যটা পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ে রক্তবর্ণ ধারণ করেছে। পাশের বাড়ির কার্নিশে কয়েকটা কাক লাফিয়ে চলছে আর চড়াই পাখিগুলো কিচিরমিচির করছে। এখন তাদের বাসায় ফেরার সময়। খগেনবাবু দোতলার বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে বসে দূরে পড়ন্ত সূর্যের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন। শহরের এই দিকটায় অজস্র গলি সাপের মতো কিলবিল করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এখানে অনেক পুরানো আমলের বাড়ি আছে, আবার অনেকে সেই পুরানো বাড়ি ভেঙে নতুন করে আধুনিক শৈলীতে বাড়ি তৈরি করেছে। ফলে এখানে নতুন আর পুরানোয় একরটা নীরব সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি সারিসারি অজস্র বাড়ির ফাঁক দিয়ে দেখা সূর্যাস্তকে যেন অনুভব করতে চাইছেন খগেনবাবু। তাঁর জীবনও আজ অস্তাচলের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। কেউ বলে তাঁর বয়স ৯৬, কেউ বলে ৯৮, আবার কেউ বলে ১০০ পেরিয়ে গেছে। সঠিক তথ্য জানার উপায় আজ আর নেই। একটা প্রাচীন বটগাছের মতো স্থবির হয়ে বসে আছেন তিনি। বটগাছের চারপাশে অসংখ্য ঝুরির মতো তাঁর মুখের বলিরেখাগুলি মহাকালের চিহ্ন হিসেবে বিচিত্র আঁকাবাঁকা ছন্দে বিস্তৃত হয়ে চলেছে। কেশ বিরল মাথায় সামান্য কয়েকগাছা সাদা শনের মতো কেশগুচ্ছ মাঝে মধ্যে হাওয়ায় ফুরফুর করে ওড়ে। ভুরু দুটির চুলও সাদা হয়ে গেছে।

খগেনবাবুর তিন কন্যা ও দুই পুত্র। কল্যাত্রয়ের মধ্যে বড়োজন প্রয়াতা হয়েছেন বেশ কিছুকাল আগে। তার অব্যবহিত পরে গত হন মেজ জামাই। এই দুটি শোক সংবাদ তাঁকে জানানো হয়নি। কারণ তাতে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে পারে। একতলায় বাস করে বড়ো ছেলে নির্মল আর দোতলায় থাকে ছোটো ছেলে শ্যামল। খগেনবাবুর স্ত্রী সৌদামিনী বছর দশেক আগে প্রয়াত হয়েছেন। তিনি জীবিত থাকাকালীন দুই ছেলেকে পৃথগান্ন করে দেন। ফলে ভিন্ন হলেও তাদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়নি। খগেনবাবু দোতলায় শ্যামলের কাছেই থাকেন। তার একটা কারণ তিনি দোতলাটা বিশেষ পছন্দ করেন। বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে নীচে রাস্তাঘাটের লোক চলাচল আর দূরের প্রান্তে বাড়িঘর, কারখানার চিমনি, গাছপালা দেখতে দেখতে তাঁর সময় কেটে যায়।

তবে ইদানীং চোখে ভালো দেখতে পান না, কানেও ভালো শুনতে পান না। একজন আয়া বহাল আছে, সকাল নটায় আসে আর সন্ধ্যা ছটায় যায়; সেই তাঁর দেখাশুনা করে। শিবপুর বাজারের কাছে কৌশিক রায় নামে এক ছোক্‌রা ডাক্তার চেম্বার খুলেছে। সেই মাঝে মধ্যে এসে খগেনবাবুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে যায়। এখন তিনি প্রায়ই চোখ বুজে ঝিম্ মেরে ইজি চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় থাকেন। তাঁকে দেখাশুনা করে যে মেয়েটি তার নাম বুলা। সে এসে বললে, 'দাদু চলুন আপনাকে ওঘরে দিয়ে আসি। আমি এবার বাড়ি যাব।' খগেনবাবু একটা মৃদু আপত্তি করবার চেষ্টা করে। বুলা

সেদিকে কান না দিয়ে খগেনবাবুকে তুলে আস্তে আস্তে ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় বসিয়ে দেয়। তারপর টিভিটা খুলে দিয়ে বলে, 'দাদু— আপনি টিভি দেখতে থাকুন। আমি এখন আসি।' খগেনবাবু ঘাড় নাড়েন। একটু পরে ছোটো বৌমা ঘরের দরজায় গঙ্গাজলের ছিঁটে দিয়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে শোনেন শাঁখের আওয়াজ। এখন সন্ধ্যা হলো। আগে তিনি এই সময় সন্ধ্যা-আহ্নিক করতেন। এখন আর পারেন না। শুধু চোখবুজে গুরুমন্ত্র জপ করবার চেষ্টা করেন। এমন সময় নাত্নি তিন্নি স্মার্ট ফোনটা সার্ফ করতে করতে এসে পাশে বসল। বলে, 'দাদু ইউটিউবে তোমাদের আমলের একটা গান শোনো।' এই বলে একটা আঙুলের ক্লিকে গানটা চালিয়ে মোবাইলটা তাঁর মুখের সামনে তুলে ধরে। গান ভেসে আসে— 'এই কি গো শেষ দান, বিরহ দিয়ে গেলে— এই কি গো শেষ দান।' খগেনবাবু দেখতে দেখে উদাস হয়ে পড়েন, তারপর তাঁর মুখ এক তৃপ্তির হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, 'গরমিল ছবির গান। রবীন মজুমদার গেয়েছিলেন। আবার এই ছবিতে অভিনয়ও করেছিলেন। সে কি আজকের কথা গা। তখন আমি কলেজে পড়ি। রূপবাণী সিনেমায় এই বইটা সবে এসেছে। আমরা দেখতে গেছি। আবার ওইদিন যারা ওই ফিল্মে অভিনয় করেছিল তারাও সবাই এসেছিল। সিনেমা ভাঙার পর দেখি রবীন মজুমদার সিগারেট টানতে টানতে বেরিয়ে যাচ্ছে। তাঁর পাঞ্জাবি একটা অংশ আমার গায়ে লাগল। ওহ্ সেটি থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স!!' খগেনবাবুর কথা শুনে তিন্নি হাসতে লাগল। বলে, 'তোমাদের আমলের হিরোরা সবাই ধুতি পরতো বুঝি?' খগেনবাবু বলেন, 'হ্যাঁ। তখন তো ধুতির যুগ। আমার বাপ-কাকারাও ধুতি পরতো। এখনতো সেসব উঠে গেছে।'

এবার তিনি টিভি সেটের দিকে চোখ রাখলেন। শুধু বাংলা নিউজ চ্যানেলগুলোই দেখেন। এটা তাঁর নেশা বলা যায়। তিন্নি ঘর ছেড়ে চলে গেল। সেদিন গভীর রাতে প্রবল ঝড় উঠল। তার সঙ্গে বজ্রপাত ও তুমুল বৃষ্টি। খগেনবাবু ঘরে একা শোন। অবশ্য পাশের ঘরেই ছেলে-ছেলের বউ থাকে। তাঁর কাছে একটা রিমোর্ট কন্ট্রোল বেলও থাকে। বালিশের পাশে সেটি রেখে তবে ঘুমো। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে দেখেন সেটি যথাস্থানে আছে কিনা। তাঁর কিরকম ভয় ভয় করতে লাগল। অথচ বেলটা টিপে ছেলে-ছেলের বৌকে ডাকতেও পারলেন না। যদি তারা বিরক্ত হয়। হাওয়ার তীব্র বেগ এসে জানালায় আছড়ে পড়ছে। একটা ঢক্ ঢক্ করে শব্দ হয়। মনে হয় কেউ যেন জানালা ঠেলছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাঁরা সারা শরীর জুড়ে শিহরণ জাগে। শরীরটা কেঁপে ওঠে। মা'র কথা মনে হয়। ছোটোবেলায় মাঝরাতে এইরকম ঝড়বৃষ্টি হলে তিনি ভয়ে মা'র বুকে মুখ গুঁজে শুতেন। মা বলত ছেলেটা খুব ভীতু হবে। অনেকদিন পর যেন মায়ের শরীরের ঘ্রাণ অনুভব করলেন। একটা অতি-অবাস্তব কল্পনা মনের মধ্যে উদয় হলো। আচ্ছা, মা যদি এখন এসে উপস্থিত হয় তাহলে কেমন হবে!

পুরানো বন্ধু-বান্ধব সবাই ছেড়ে চলে গেছে, সমসাময়িক আত্মীয়-স্বজনও কেউ আর অবশিষ্ট নেই। বিশাল সমুদ্রের বুকে একটা নির্জন দ্বীপের মতো তিনি যেন একা, নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন। তিনি এখন শুধু নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলেন। শরীরের ছায়াটাই এখন তাঁর একমাত্র সঙ্গী। আর বাকি আত্মীয়-স্বজন-পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে তিনি এখন এক প্রাচীনতম ব্যক্তি। যখন দোতলার বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে থাকেন, তখন পথ-চলতি চেনা-জানা দু'একজন মানুষ ওপর দিকে তাকিয়ে বলে, 'কী দাদু কেমন আছ?' ব্যস ওই পর্যন্তই। সৌদামিনী তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে বহুকাল আগে। সৌদামিনী বলতো, 'আমার আগে যেন তুমি চলে যাও। আমি আগে চলে গেলে তোমার খুব কষ্ট হবে।' কিন্তু সৌদামিনী কথা রাখেনি।

পরদিন সকালে খগেনবাবু বারান্দায় বসে আছেন। এমন সময় শ্যামলের বউ অঞ্জলি এসে পাশের টেবিলে চায়ের কাপটা রেখে বললে— 'বাবা চা দিয়ে গেলাম।' কিছুদূর চলে গিয়ে আবার ফিরে এসে বলে— 'বাবা, গতকাল আপনার ভাইপো আপনার ছেলেকে ফোন করেছিল। বললে রাঁচিতে বীণাপানি বলে আপনার ছোটো মাসি থাকেন। তাঁর ছেলে কলকাতায় এসে আপনার ভাইপোর সঙ্গে যোগাযোগ করে। তাঁরা আপনার ব্যাপারে জানতে চাইছিলেন।'

ঘোলাটে চোখে খগেনবাবু বলে— 'ছোটো মাসি— রাঁচিতে? এখনো আছে? তারও তো অনেক বয়েস হয়ে যাওয়ার কথা বউমা।

ছোটো বউমা বলে— 'হ্যাঁ বাবা, আপনার ছোটো মাসি বেঁচে আছেন। তাঁর বয়স এখন ১০৬ বছর। তবে বয়সের তুলনায় ভালো আছেন। কিন্তু ধরে ধরে নিয়ে যেতে হয়। কলকাতায় ওঁরা এসেছেন ডাক্তার দেখাতে। বলেছেন আজ বিকালে আমাদের বাড়ি আসবে।

খগেনবাবুর চোখটা যেন চিক্‌চিক্ করে ওঠে। কয়েক ফোঁটা অশ্রু আপনা হতে গড়িয়ে পড়ে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলেন— 'ছোটো মাসি আসবে! সত্যি!' বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় একটা ট্যাক্সি 'উমাপতি নিবাস' এর সামনে এসে থামল। প্রথমে দুজন ভদ্রলোক ও তারপর এক ভদ্রমহিলা ওই ট্যাক্সি থেকে নামলেন। এরপর দুজন ভদ্রলোক অতি

সন্তর্পণে এক অতি প্রবীণা মহিলাকে ধরে আস্তে আস্তে ট্যাক্সি থেকে বের করে আনলেন। ওই প্রবীণা মহিলাকে ধরে দুজন ভদ্রলোক ও একজন মহিরা উমাপতি নিবাসে প্রবেশ করলেন। বাড়ির ভেতরে যেন একটা সমবেত শব্দের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস বয়ে গেল। নির্মল আর শ্যামল দুই প্রবীণ ভ্রাতৃদ্বয় প্রবীণাকে টিপ্‌টিপ্ করে প্রণাম করে বলে— 'এই বয়সে ছোটো দিদিমাকে আবার যে দেখবো আশা করিনি।' প্রবীণা মহিলা ফোক্‌লা মুখে সরল শিশুর মতো হাসতে লাগলেন।

খগেনবাবু পরিপাটি করে লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে ঘরে খাটের ওপর বসে আছেন। পাশে দাঁড়িয়ে সর্বক্ষণের সঙ্গিনী সেবিকা বুলা। সবাই মিলে বীণাপাণিদেবীকে ধরে আস্তে আস্তে খগেনবাবুর ঘরে প্রবেশ করলে। খগেনবাবু প্রথমে যেন স্বপ্ন দেখার মতো ঘোরে তাকিয়ে রইলেন। সেই বৃদ্ধা আস্তে আস্তে তাঁর বিছানার কাছে এগিয়ে এসে বলে— 'হ্যাঁরে খগা তুই এত বুড়ো হয়ে গেলি কবে? এইতো সেদিন হলি।' খগেনবাবুর মুখে অমায়িক হাসি, চোখে টলটল করছে জল। বৃদ্ধা বলে চলেন— 'তখন তোর বাপ ইভের ইস্টিশন মাস্টার। তখন তুই খুব ছোটো। বিকালে তোকে কোলে নিয়ে পাহাড়ি রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। চারদিকে জঙ্গল। এমন সময় এক সাঁওতাল কুলি আমায় দেখতে পেয়ে বললে— 'এ মায়ি ওই দিকে যাস না। ময়াল সাপ বেরোয়। ধরে লিবে।' ওহ্ যা ভয় পেয়েছিলুম। তোকে বুকে চেপে পড়ি কী মরি করে দৌড়েছিলুম।' বৃদ্ধার কাহিনি শুনে সবাই হাসতে লাগল। বৃদ্ধা এবার খগেনবাবুর পাশে বসলেন। খগেনবাবু নীচু হয়ে যেন তার পা ছুঁতে গেলেন। বৃদ্ধা তাঁকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন। খগেনবাবুর শরীরজুড়ে এক অদ্ভুত শিহরণ জাগল। অনেককাল আগে হারিয়ে যাওয়া মায়ের শরীরের ঘ্রাণ আবার যেন অনুভব করতে লাগলেন। সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ জুড়ে এক অনাবিল তৃপ্তি তাঁকে যেন ভরিয়ে দিল। তখন দুরে কোনো এক বিয়ে বাড়িতে বেজে উঠেছে সানাইয়ের সুর। ইমনকল্যাণ রাগে সেই সুরের মূর্ছনা যেন আকাশ বাতাস মথিত করে তাঁর সমস্ত অন্তর্লোক ভরিয়ে তুলছে এক পরিপূর্ণ আনন্দের স্রোতে। ছোটো মাসিকে সুদীর্ঘকালবাদে কাছে পেয়ে খগেনবাবু যেন আকাশের চাঁদ পেলেন। দুজনের কথার স্রোত যেন আর থামতে চায় না। তিনি ছোটোমাসিকে বলেন, 'আচ্ছা তোর (উনি ছোটো মাসিকে তুই বলতেন) মনে আছে দিদিমা কতরকম ছড়া কাটতো। ছোটোমাসি বলে— 'হ্যাঁরে সেসব কতকাল আগেকার কথা। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছি, সেসব কবেই ভুলে গেছি। একটা মনে আছে— ঘরেতে পুষেছি সং, আর কত দেখবো ঢং।' ছোটোমাসির বলার ধরন দেখে চারপাশের সমবেত সবাই হেসে উঠল। তিন্নি বলে, 'দিদু— আর একটা ছড়া বলো।'

বীণাপাণিদেবী মাথা নীচু করে কিছু সময় ভাবলেন তারপর একগাল হেসে বলেন— তিন পয়সার উচ্ছে, সেইখানে মন ঘুচ্ছে।' তিন্নি লাফিয়ে উঠে হাততালি দিয়ে বলে, 'দারুণ! দারুণ!'

এবার ওঁদের যাবার পালা। ছোটোমাসিকে উদ্দেশ্য করে খগেনবাবু বলেন— আবার কবে আসবি?' ছোটোমাসি ওপরের দিকে আঙুল তুলে বলেন— 'আসবো— যদি পাগলাটা না টেনে নেয়।' ছোটোমাসির ছেলে অমরনাথ বলে— 'খগেনদা তুমি একদিন আমাদের ওখানে এস।' খগেনবাবু বলেন— 'ওরে আমার তো ফুল টাইম খেলা হয়ে গেছে। এখন এক্সস্ট্রা টাইমের খেলা চলছে। রেফারি কখন শেষ বাঁশি বাজিয়ে দেয় কে জানে।' শুনে অমরনাথ স্মিত হাসে। সবাই দাঁড়িয়ে উঠে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়। এমন সময় ছোটোমাসি বলেন, ওই যা। তোকে জিনিসটা দিতেই ভুলে যাচ্ছি। এই বলে তিনি খবরের কাগজে মোড়া একটা বই ব্যাগ থেকে বার করে বলেন— 'অনেককাল আগে তোর বাপের কাছ থেকে শরৎ চাটুজ্জ্যের লেখা এই বইটা পড়তে নিয়েছিলুম আর ফেরত দেওয়া হয়নি। এই বইটায় শরৎবাবুর সই আছে। যদিও ঝাপসা হয়ে গেছে। তবু বেশ বোঝা যায়। তখন শরৎ চাটুজ্জে মশাই এই বাজে শিবপুরে থাকতেন। তোর বাপ খুব নভেল পড়ত। একবার শরৎবাবুর বই কিনে, তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে, বইয়ে সই করিয়ে নিয়ে আসে। অনেক দিন আগে পুরানো জিনিসপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে বইটা খুঁজে পেয়েছিলুম। তখনই ভেবেছিলুম যে সুযোগ পেলে তোদের দিয়ে আসবো।'

খগেনবাবু বইটা হাতে নিয়ে বিস্মিত হয়ে বলেন, 'বইটাতো একটা অ্যাসেট বলা যায়!!'

এবার ছোটোমাসি খগেনবাবুর চিবুক ধরে বললেন, 'সাবধানে থাকবি রে খগা। সময়মতো চান, খাওয়া-দাওয়া করবি আর ওষুধ খেতে ভুলবি না।'

খগেনবাবু হাসেন।

ওরা সবাই এবার আস্তে আস্তে নীচে নেমে উমাপতি নিবাসের বাইরে এসে রাস্তার ধারে দাঁড়ালেন। খগেনবাবু লাঠি হাতে গুটি গুটি পায়ে দোতলার বারান্দায় এসে রেলিঙে ঝুঁকে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

একটা ট্যাক্সি এসে থামে। তাঁরা সবাই ওপরে খগেনবাবুর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়েন। খগেনবাবু কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে বলেন— 'দুর্গা, দুর্গা।' ট্যাক্সিটা এবার স্টার্ট দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে।

পিছনে পড়ে থাকা একরাশ কালো ধোঁয়া স্মৃতির মতো মিলিয়ে যায়। ■

জড়ভরতের কাহিনি

বহু বহু বছর আগে ভারতবর্ষে ভরত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি খুব ধার্মিক ও প্রজাবৎসল ছিলেন। প্রজাদের সবাকেই তিনি ঈশ্বরের সেবা মনে করতেন। তাঁর রাজ্যে সবাই সুখ বাস করত।

রাজার পাঁচ পুত্র। তারা শিক্ষায় দীক্ষায় গুণবান হয়ে বড়ো হয়ে উঠল। রাজা রাজপুত্রদের হাতে রাজ্যের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে ঈশ্বরের নাম গুণগান করে বাকি জীবন কাটাতে মনস্থ করলেন। তাই একদিন পুত্রদের ডেকে বড়ো পুত্রকে রাজপদে অভিসিক্ত করে বাকি চার পুত্রকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব দিয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বনে চলে গেলেন।

গভীর অরণ্যে এক জলাশয়ের ধারে রাজা কুটির নির্মাণ করে ভগবানের সাধনা করে দিন কাটাতে লাগলেন। ফুল তোলা, কাঠ কাটা, ফল সংগ্রহ করা সব কাজ তিনি নিজ হাতেই করতে লাগলন। বাকি সময় ভগবানের সাধনায় ডুবে থাকলেন। এই ভাবে তাঁর মন সংসারের সব বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যেতে লাগল। তাঁর মন এক অনাবিল আনন্দে ভরে উঠতে লাগল।

রাজা একদিন জলাশয়ে স্নান করার সময় দেখলেন একটি হরিণশিশু জলে ভেসে যাচ্চে। রাজার মন করুণায় ভরে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি হরিণশিশুটিকে জল থেকে কোলে তুলে নিলেন। তারপর ডাঙ্গায় এনে ছেড়ে দিয়ে কুটিরের দিকে রওনা হলেন। কিন্তু দেখলেন হরিণশিশুটি তাঁর পিছনে পিছনেই আসতে লাগল। তিনি দয়াপরবশ হয়ে কোলে তুলে নিয়ে আশ্রমে এলেন। হরিণশিশুটির উপর রাজার মায়া জন্মে গেল। তিনি মায়ের মতো সেটিকে লালনপালন করতে লাগলেন। এসব করতে করতে রাজা ভগবানের সাধনা করতে ভুলে গেলেন। তিনি তাঁর মনকে সান্তনা দিতে লাগলেন যে, জীবের সেবাই তো ভগবানের সেবা। সাধনভজন তাঁর মাথায় উঠল। হরিণশিশুটির সেবাযত্নেই তাঁর দিন অতিবাহিত হতে লাগল।

সেবাযত্নে হরিণশিশুটি বড়ো হলো। তার সঙ্গে রাজাও বনে বনে ঘরতে লাগলেন। সন্ধ্যায় কুটিরে ফিরে রাজা হরিণটির সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়েন। হরিণটিকে ছাড়া তিনি



থাকতেই পারেন না। এভাবে বহুদিন গত হলো। রাজা বৃদ্ধ হয়ে পড়লেন। তারপর একদিন মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করলেন। হরিণের কথা ভাবতে ভাবতেই একদিন তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

হরিণের কথা ভাবতে ভাবতে প্রাণত্যাগ করার ফলে রাজা আর একটি গভীর জঙ্গলে হরিণ হয়ে জন্ম নিলেন। হরিণ হলেও পূর্বজন্মের সাধনার ফলে তাঁর আগেকার সব কথাই মনে রইল। আর যেন মায়ায় জড়িয়ে না পড়েন তারজন্য সতর্ক থাকতেন। তিনি আগেকার কুটিরের কাছে ফিরে এসে শুকনো ঘাসপাতা খেতেন আর ভগবানের নাম করতেন। ক্রমে ক্রমে হরিণরূপী রাজা বৃদ্ধ হয়ে মারা গেলেন। তারপর এক ধার্মিক ব্রাহ্মণের পরিবারে জন্ম নিলেন। এবারেও তিনি জাতিস্মর হলেন। পূর্ব জন্মের সাধনার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সর্ব শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করলেন। কিন্তু মায়ায় জড়িয়ে পড়ার ভয়ে তিনি কথা বলতেন না। চুপ করে কোনও এক জায়গায় বসে থাকতেন। এমনকী ভালোভাবে কাপড়চোপড়ও পরতেন না।

এসব দেখেশুনে সবাই তাঁকে জড়ভরত বলে ডাকতে শুরু করল।

কিশোর বয়সেই তিনি পিতৃহারা হলেন। আত্মীয়স্বজনরা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন বালককে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। এখানে ওখানে খেয়েদেয়ে বালক একসময় হৃষ্টপুষ্ট যুবকে পরিণত হলেন। একদিন রাস্তার ধারে গাছের নীচে বসে ছিলেন। সেসময় সৌবীর রাজ পালকি চেপে কোথাও যাচ্ছিলেন। পালকি বাহকরা জড়ভরতকে পালকি বাহকের কাজে লাগিয়ে দিল। জড়ভরত পালকি বহনের কাজে পটু ছিলেন না, তাই পা বেচালে পড়ে পালকি একটু দুলে উঠলে রাজা বিরক্ত হয়ে জড়ভরতকে ধমক দিয়ে শাস্তি দেওয়ার ভয় দেখালেন।

জড়ভরত বললেন, 'মহারাজ, এই শরীরটাকে তো শাস্তি দেবেন, আমাকে স্পর্শ করতেই পারবেন না।' সামান্য একজন পালকি বাহকের মুখে এরকম কথা শুনে রাজা পালকি থেকে নেমে জড়ভরতের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। জড়ভরত তাঁর পূর্ব জন্মের বর্ণনা দিয়ে রাজাকে বললেন, রাজন্, এই জগতে কেউ রাজা-প্রজা, গরিব-ধনী নয়, সবাই আত্মা, সবাই ব্রহ্ম। আমি আর আপনি একই। রাজা জড়ভরতের পায়ে পড়ে প্রণাম করলেন। বললেন, আজ আমার জীবন সার্থক হলো। না জেনে আপনাকে কষ্ট দিয়ে অপরাধ করেছি। আমি মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেলাম। আমাকে ক্ষমা করুন।

জড়ভরত রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার ভগবানের সাধনা করতে গভীর অরণ্যে চলে গেলেন।

—হরিপদ ঘোষ

ভারতের পথে পথে

সাঁচী



সম্রাট অশোকের স্মৃতিবিজড়িত শহর সাঁচী। মৌর্য সম্রাট বিন্দুসারের পুত্র অশোক ভাইদের হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। তারপর কলিঙ্গের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বিতলিত হয়ে যুদ্ধ পরিহার করে ২৬১ খ্রিস্ট্রপূর্বাব্দে সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাছে দীক্ষা নেন এই সাঁচীতেই। চণ্ডাশোক থেকে সম্রাট অশোক হলেন ধর্মাশোক। তিনি রাজপ্রাসাদ শ্রমণদের দান করে বাস করতে লাগলেন সঙ্ঘারামে। ভগবান বুদ্ধের মহানির্বাণের পব তাঁর দেহাবশেষের স্মারক রূপে সারা ভারতে ৮৪ হাজার স্তূপ গড়েন সম্রাট অশোক। তারমধ্যে ৮টি সাঁচীতে। ৩টি আজও অক্ষত রয়েছে। সাঁচীর মূল আকর্ষণ ১নম্বর বৃহৎ স্তূপ। রেলিং ঘরা স্তূপের চারটি তোরণ প্রথম শতকে সাতবাহন রাজাদের তৈরি। ২ ও ৩ নম্বর স্তূপটিও কম আকর্ষণীয় নয়। এছাড়াও সাঁচীর নতুন আকর্ষণ সারনাথের আদলে সিংহলের বৌদ্ধ সমাজের গড়া একটি বিহার। এতে বুদ্ধ শিষ্যের দেহাবশেষ রয়েছে। এর বীপরিতে রছেছে সিংহল থেকে আনা বোধিবৃক্ষ।

জানো কি?

পুরো নাম

- PAN-- Parmanent Account Numbur.
- PDF--Porteble Document Format.
- SIM--Subscriber Indentity Module.
- ATM--Autometed Teller Machine.
- Wi-Fi--Wireless Fidility.
- DTP-- Desk Top Publishing.
- RAM-- Random Access Memory.

ভালো কথা

দিয়ে খেতে হয়

স্কুলে যাবার সময় মা প্রতিদিন টিফিনবক্সে কিছু না কিছু ভরে দেয়। কোনওদিন রুটি-আলুভাজা, কোনওদিন চাউমিন, কোনওদিন পরোটা, আবার কোনওদিন লুচি-তরকারি। তারসঙ্গে একটা ডিমসেদ্ধ। আমাদের টিফিনের সময় হলেই কোথা থেকে একটা বুড়ো দাদু স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে আমাদের টিফিন খাওয়া দেখতে থাকে। কয়েকদিন পর আমি কাছে গিয়ে বললাম দাদু খাবে? দাদু বলল হ্যাঁ দিদি খুব খিদে পেয়েছে। আমি অর্ধেক দাদুকে দিলাম। দাদু খেয়ে আমাকে বলল তুমি খুব ভালো। তারপর বলল আমার কেউ নেই দিদি। তারপর থেকে আমি রোজ দাদুকে দিয়ে খাই। একমাস পর দেখি মা টিফিন বাক্সে অনেক বেশি খাবার দিয়েছে। মা বলল আমি লুকিয়ে দেখেছি তুই রোজ দাদুকে খেতে দিস তাই বেশি করে দিই। গরিবদের দিতে হয়। মা'র কথা শুনে আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠল।

শ্রেয়া দাস, চতুর্থ শ্রেণী, দিপালীনগর, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) শৈ খ ল র	(১) ঘা ক বি স শ্বা ত
(২) বে ম না দ	(২) লা ও য় সা য়া প

১৩ মে সংখ্যার উত্তর

(১) অকালপক্ক (২) ইঁচড়েপাকা

১৩ মে সংখ্যার উত্তর

(১) বিজ্ঞাপনদাতা (২) বিচিত্রানুষ্ঠান

উত্তরদাতার নাম

(১) সংজ্ঞা ঘোষ, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি। (২) শুভ চৌহান, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিঃ। (৩) জ্যোতিকৃষ্ণ ঘোষ, বেগড়ী, হাওড়া। (৪) শুভদীপ বাগ, আন্দারথোল, বাঁকুড়া।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। পরীক্ষিৎ।। ২৪।।



চ্যাম্পিয়নস লিগে ব্রিটিশ রাজ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও প্রভাবী খেলাটির জন্ম ইংল্যান্ডে। অথচ মাত্র একবার করে বিশ্বকাপ ও ইউরোকাপ জেতা রাষ্ট্রটি ইদানীংকালে কাগুজে বাঘ হয়েই দিনাতিপাত করছিল। চাকাটি ঘুরতে শুরু করে ২০১৮ থেকে। গত বছর বিশ্বকাপ সকার প্রতিযোগিতায় সেমিফাইনালে ফিনিশ করে ইংল্যান্ড দল। অসাধারণ লড়াই করে বিশ্বফুটবলে সবচেয়ে সাড়াজাগানো দল ক্রোয়েশিয়ার কাছে হার মানে ইংল্যান্ড। তার আগের বছরই ভারতে অনুষ্ঠিত 'অনূর্ধ্ব ১৭' বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইংল্যান্ড, ফাইনালে সল্টলেক স্টেডিয়ামে স্পেনকে চূড়ান্ত পর্যদুস্ত করে। তখনই বোঝা গেছিল ব্রিটিশ অ্যাকাদেমিগুলো ঠিকঠাক কাজ করছে বলেই এই সাফল্য এসেছে যা ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে ব্রিটিশ মহিমাকে তুলে ধরবে। ঠিক তাই দেখা গেল গত সিনিয়র বিশ্বকাপ এবং সাম্প্রতিক সময়ে উপেক্ষা চ্যাম্পিয়নস শিপ এবং ইউরোপা লিগে।

ইংল্যান্ডের ১৩৫ বছরের পুরনো ক্লাব টটেনহ্যাম হটস্পার এই প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল খেলবে। তাদের প্রতিপক্ষ আর এক ঐতিহ্যশালী ও বিশ্বজনীন প্রভাব বিস্তারকারী লিভারপুল। অন্যদিকে ইউরোপা লিগের ফাইনালেও যুযুধান দুই ব্রিটিশ ক্লাব। আর্সেনাল ও চেলসি ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী ও জনপ্রিয় দুই ক্লাব এবং আগেও চ্যাম্পিয়নস ও ইউরোপা লিগ দুইই জিতেছে। সব মিলিয়ে ব্রিটিশ ফুটবলে নব সূর্যোদয়। ভারতের কিংবদন্তী আন্তর্জাতিক ফুটবলার তথা রনজি ক্রিকেটার চুনি গোস্বামী যেন একটু বেশিই আবেগতাড়িত টটেনহ্যাম হটস্মারকে নিয়ে। তাঁর আবেগপ্লাবিত হবার সঙ্গত কারণও আছে। ১৯৬০ সালে তাঁর কাছে ব্রিটিশ ক্লাবটির আমন্ত্রণ এসেছিল জনপ্রিয় ভাষ্যকার লিয়ারসন সুবিটার মাধ্যমে। সুবিটা ছিলেন স্কটিশ বংশোদ্ভূত এবং ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে যোগসূত্রকারী। যদিও চুনি সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। নাহলে চুণী তাঁর জাদুকরী স্কিল দিয়ে সহজেই ব্রিটিশ ফুটবল প্রেমীদের মন জয় করে নিতে পারতেন।

টটেনহ্যাম সেমিফাইনালে হয়েছে ডাচ ফুটবলের সবচেয়ে বড়ো শক্তি আয়াখস আমস্টারডামকে হারিয়েছে। সেই আয়াখস যে কিনা ৭০ ও ৮০-র দশকে গোটা ইউরোপজুড়ে রাজ করেছে। টোটাল ফুটবলের জন্মদাতা দেশ নেদারল্যান্ড ও তার সেরা ক্লাবটি বরাবর টোটাল এবং ডায়মন্ড সিস্টেমে খেলে আধুনিক ফুটবলের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে।



মাটি এবং শূন্যে যার স্কিল ও নান্দনিক সুষমা বছরের পর বছর বিশ্ববাসীকে মোহিত করে রেখেছিল সেই অকালপ্রয়াত যোহান ক্রুয়েফের ক্লাব অনেক বছর পর চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল খেলবে। ১৯৯৬-য়ে তারা শেষবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেমিফাইনালের প্রথম পর্বে আয়াখসই জিতেছিল কিন্তু পরবর্তী পর্বে ঘরের মাঠে খেলার সুবিধে পুরো মাত্রায় উশুল করে টনেনহ্যাম দৃষ্টিনন্দন অথচ কার্যকরী ফুটবল খেলে আয়াখসকে জমি ধরিয়ে দেয়। রূপকথার প্রত্যাবর্তন যেন অনেকটা ধ্বংসস্তূপ থেকে ফিনিক্স পাখির মতো বেঁচে ওঠা। তাও ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারিকেন এবং তারকা ফুটবলার ভেলে আলির সাহায্য না পেয়েও এভাবে ঘুরে দাঁড়াবে টটেনহ্যাম, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি স্পারস সমর্থকরা। অপর সেমিফাইনালে যা দেখা গেল তা বোধহয় রূপকথাকেও হার মানাবে। মেগাস্টার সমৃদ্ধ বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্লাব বার্সেনোলা ঘরের মাঠে লিভারপুলকে চূর্ণ করে দেয়। গ্রেট মাস্টার মেসি ছেলেখেলা করেন লিভারপুলের জমজমাট ভিয়েন্সকে নিয়ে। ৩-০ গোলে এগিয়ে থাকা অবস্থায় স্পেনের ক্লাবটি লিভারপুলের অ্যানফিল্ডে আসে যেন চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে উঠেই গিয়েছে এমন একটা ভাব নিয়ে। আর সেটাই কাল হলো ভালভার্দের ছেলেদের। লিভারপুল এই ম্যাচে পায়নি তিন অসাধারণ ফুটবলার মহম্মদ সালাহ, বরার্তো ফির্মিনহো, সাদিও মানেকে। কে ভেবেছিল এই ত্রয়ী ছাড়াই অন্য গ্রহের ফুটবল খেলবে লিভারপুল? নবোদিত ব্রিটিশ নক্ষত্র জর্ডন হেল্ডারসনের নেতৃত্বে যে প্রেসিং ফুটবলের দৃষ্টান্ত সেদিন মেলে ধরেছিল লিভারপুল ফুটবলাররা তা যেন ববিমূর, ববি চার্লটন, জিওফ হার্স্ট, গর্ডন ব্যাঙ্কসদের সময়ের ভয়ংকর সুন্দর ব্রিটিশ ফুটবল দর্শনকেই মনে পড়িয়ে দিয়েছিল। ফাইনালে অবশ্য লিভারপুল ও টটেনহ্যাম দুই দলই তাদের প্রাণ ভোমরাদের সাহায্য পাবে। তাই আশা করা যায় মহাকাব্যিকে এই ফাইনালের। ইউরোপে ক্লাব ফুটবলের সেরা টুর্নামেন্ট চ্যাম্পিয়নস লিগ। আর তার পরের ধাপেই আছে ইউরোপা লিগ। এবার ইউরোপা লিগের ফাইনালে আর্সেনাল ও চেলসি যারা ২০০৫ সালে এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলেছিল। চেলসি গত বছর এই কাপটি জয় করেছিল। ২০১২ সালে তারা চ্যাম্পিয়ন হয় চ্যাম্পিয়নস লিগেও। মাউরিসিও সাররির দলটি এবার এক পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাতেও গাপার্সরা ট্রাডিশনাল প্যাটার্নকে ছেড়ে দিয়নি। নিজস্ব ঘরানার ফুটবল খেলে একের পর এক নামি-দামি দলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে এসেছে। বেলজিয়াম অধিনায়ক অলরাউন্ড দক্ষতাসম্পন্ন এডেন হ্যাজার্ডের চেলসি অবশ্য তাদের সামনে বাধার প্রাচীর তুলে দেবে ফাইনালে। আর্সেনালের রক্ষাকবচ আবুমেয়ংকে সেদিন অবশ্যই বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। ব্রিটিশ ফুটবলের চিরাচরিত 'কিক অ্যান্ড রান' নির্ভর দ্রুতগতির কাউন্টার অ্যাটাক সকার খেলবে দুই দল। তবে ধারে ভারে এগিয়ে কিন্তু চেলসি। ■

পশ্চিমবঙ্গে গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করছেন মমতা

রবীন্দ্রনাথ দত্ত

ভারতে ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের বাদ্যে কাঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রচারের নামে প্রলয় নৃত্য আরম্ভ করেছেন। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি যেভাবে প্রধানমন্ত্রীকে কোমরে রশি দিয়ে ঘোরাবেন, দাঙ্গা বাঁধানোর জন্য ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে হিসাব নেবেন, থাপ্পড় মারবেন, কান ধরে ওঠ-বোস করাবেন বলে গালি দিচ্ছেন তা সমস্ত রকম শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করেছে। মুখ্যমন্ত্রীকে কয়েকটা প্রশ্ন করি, (১) গত ১৩-৩-২০১৩ তারিখের একটি দৈনিক পত্রিকায় আইপিএস অফিসার নজরুল ইসলামের একটি বিস্ফোরক চিঠির কপি ছাপা হয়েছে, তাতে মুখ্যমন্ত্রীকে অসৎ, মিথ্যাবাদী, ঘুষখোর এবং তাঁর ইস্ট জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রি জাল বলে উল্লেখ করেছেন। এতদসত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নজরুলের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবার সাহস দেখাননি। কারণ মুসলমান ভোট হারানোর ভয়। নজরুলের অভিযোগগুলি মিথ্যা প্রমাণ করার মতো কোনও তথ্য মমতার ছিল না।

(২) টিএমসি-র প্রাক্তন এমএলএ তথা প্রাক্তন আইএএস দীপক ঘোষ তাঁকে উদ্দেশ্য করে কয়েকটা বই লিখেছেন। যেমন 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেমন দেখেছি', 'এ কেমন মমতা'। ওই বইগুলোতে যেসব অভিযোগ করেছেন তা খণ্ডন করতে আপনি কি দীপক ঘোষের সম্মুখে হাজির হয়ে তার জবাব দিতে রাজি আছেন?

আপনার কয়েকটি অভিযোগের উত্তর আমি দিচ্ছি—

(১) প্রথম অভিযোগ গান্ধী হত্যার জন্য আপনি আরএসএস এবং বিজেপিকে দায়ী করেছেন। এই প্রবন্ধকার গান্ধীহত্যার পুরো জাজমেন্ট পড়েছে তাতে কোথাও আরএসএসকে দায়ী করা হয়নি, সুতরাং আপনার অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা।

(২) দ্বিতীয় অভিযোগ, নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি দাঙ্গাবাজদের দল। গান্ধী হত্যার পর মহারাষ্ট্র ব্যাপী ব্রাহ্মণদের উপর যে অত্যাচার হত্যা ও গৃহদাহ করেছিল তারা কারা? ব্রাহ্মণদের উপর এই অত্যাচারের কারণ ছিল নাথুরাম একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১৯৮৪-এ বিহার দাঙ্গা, ইন্দিরা হত্যার পর দিল্লির হাজার হাজার শিখ হত্যা, ভাগলপুর, মিরাট, মুরাদাবাদ আহমেদ নগর, মুম্বই, নেলি, কোকড়াঝাড় দাঙ্গার সময় কেন্দ্রে এবং রাজ্যে কংগ্রেস সরকার ছিল। আপনি তো তখন কংগ্রেসি।

(৩) আপনি বলেছেন নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপি দেশকে টুকরো টুকরো করতে চায়। দেশভাগের জন্য দায়ী মুসলিম লিগ, কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টরা। দেশভাগের প্রাক্কালে মুসলিম লিগের অত্যাচারে ২০ লক্ষ নিরীহ হিন্দু ও শিখ খুন হয়েছে। লক্ষ লক্ষ পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে। অসংখ্য নারী মুসলিম লিগ গুন্ডাদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে। তাদের ঔরসজাত সন্তানদের দিল্লির কারোলবাগ কাপুর হাসপাতালে হত্যা করা হয়েছে। অথচ সেই মুসলিম লিগ আপনার সহযোগী। বহরমপুর সভায় আপনিই বলেছেন মুসলিম লিগও আমার সঙ্গে আছে।'

(৪) আপনি বলেছেন— জরুরি অবস্থা চলছে। অপনার গুরুমা ইন্দিরা জরুরি অবস্থা জারি করে ১ লক্ষ ২৫ হাজার বিরোধী দলের নেতাকে জেলে পুরে দিয়েছিলেন। ভারতের জেলগুলিতে যে সংখ্যক কয়েদি থাকার ব্যবস্থা রয়েছে তার পাঁচগুণ কয়েদি গাদাগাদি করে থাকতে বাধ্য হয়। তার উপর অতিরিক্ত ১ লক্ষ ২৫ হাজার বিরোধী নেতা-কর্মী, অটলবিহারী বাজপেয়ীর মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতাকে জেলে পুরে কয়েকদিনের জন্য বরাদ্দ সাদা-নীল ডোরা পাজামা-ফতুয়া পরতে বাধ্য করা হয়েছে। জর্জ ফার্নানডেজকে পায়ে শিকল বেঁধে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে জেলে পোরা হয়েছে। রাজমাতা বিজয়রাজে সিন্ধিয়া এবং গায়ত্রীদেবীকে (কোচবিহারের রাজকন্যা) মাটিতে শুতে এবং জেলের লপসি খেতে বাধ্য করা হয়েছে। বরুণ সেনগুপ্ত, গৌরকিশোর ঘোষের মতো সাংবাদিকদের জেলে পুরে রাখা হয়েছে। কলকাতার সমস্ত সংবাদপত্র রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এনে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সইয়ের পর ছাপানো হতো। সেই ব্যক্তি আপনার দাদা তিনি এখনো আপনার মন্ত্রীসভা আলোকিত করে বসে আছেন। ইন্দিরা জরুরি অবস্থার সমর্থনে স্বাক্ষর করতে বাঙ্গলার বিশিষ্টজনদের বাধ্য করা হয়েছে। স্বাক্ষরদাতাদের প্রথম নাম বিশিষ্ট ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। সেই হ্যান্ডবিল আমার সংগ্রহে আছে।...আচ্ছা, জয়প্রকাশ নারায়ণ যখন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সভা করতে এসেছিলেন তখন জনৈকা যুব কংগ্রেস নেত্রী তার গাড়ির বনেটের উপর উঠে নৃত্য করেছিলেন। তাকে কি মমতা দেবী চেনেন?

আপনি যেভাবে প্রচার সভার শেষে চৌকিদার চোর হ্যায় বলে জনসাধারণকে উত্তেজিত করছেন তার ফল কী হবে জানেন? চৌকিদার নরেন্দ্র মোদীকে হাতে কাছে না পেয়ে তার সমর্থকদের ওপর আক্রমণ করছেন। তারাও ছেড়ে কথা বলবে না। এই ভাবে পশ্চিমবঙ্গে একটা গৃহযুদ্ধের পরিবেশ আপনি সৃষ্টি করছেন।

আপনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবার দিবাস্বপ্ন দেখছেন, কিন্তু আপনার জন্মপঞ্জিকায় লেখা আছে আপনার সে আশা পূর্ণ হবে না। আপনার অন্যসব মিঁয়াভাই-দোসররা চুপচাপ থেকে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে। যেমন ফিরহাদ মিঁয়া আপনার সমর্থনে চাটিম চাটিম বুলি ভাঁজছেন, তিনি আশায় আছেন আপনি প্রধানমন্ত্রী হলে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার খুলে দিয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ঢুকিয়ে এটাকে গ্রেটার বাংলাদেশ করার পথকে ত্বরান্বিত করবেন। তখন আপনার কী হবে? ■

কমল হাসানের টনিকে পাবলিকের বদহজম

সন্দীপ চক্রবর্তী

ধর্মনিরপেক্ষতার নামে নির্বিচার মুসলমান তোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ কি সোশ্যাল মিডিয়ায় এইভাবেই ফুঁসে উঠছেন না? খবরের কাগজ যে গল্পই শোনাক, ধর্মনিরপেক্ষতার তত্ত্বটিকে প্রত্যাখ্যান করছে মানুষ। কারণ সবাই জেনে গেছে আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে হিন্দুবিদ্বেষ।



একটা সময় ছিল যখন বিতর্ক তৈরির একমাত্র মাধ্যম ছিল খবরের কাগজ। বামপন্থী হার্মাদদের দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাথা ফাটিয়ে জ্যোতি বসু বলতেন, 'যাক! এতক্ষণে ব্যাপারটা আমিষগন্ধী হলো।' বাম নেতার এহেন অশিষ্টাচারের প্রতিবাদে কেউ কেউ সংবাদপত্রের চিঠিপত্র বিভাগে চিঠি লিখতেন। কিন্তু তারা সংখ্যায় ছিলেন অল্প। এখন যদি কেউ জ্যোতিবাবুর মতো ভেবেচিন্তে বাজার গরম করা মন্তব্য করেন তাহলে আর রক্ষে থাকবে না। পুরো খিল্লি হয়ে যাবেন। যেমন হচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি একজন প্রিয়াঙ্কা শর্মাকে চমকাতে গিয়ে অন্তত কয়েক ডজন প্রিয়াঙ্কা শর্মার জন্ম দিয়ে ফেলেছেন। এখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় মমতাকে নিয়ে মিম তৈরি হচ্ছে। কতজনকে অ্যারেস্ট করবে পুলিশ? সুতরাং, 'এবার বাঙ্গলা পারলে সামলা'।

একই সমস্যায় পড়েছেন দক্ষিণের সুপারস্টার কমল হাসানও। সিনেমার কোনও দৃশ্য ভালো লাগলে চটরপটর হাততালি দেয় পাবলিক। এই হাততালির লোভ বড়ো সাংঘাতিক। কখন কাজের জন্য হাততালি পাচ্ছেন আর কখন হাততালির জন্য কাজ করছেন সেই বিচারবোধ অভিনেতাদের সবসময় থাকে না। কমল হাসান সেটি একেবারে হারিয়েছেন। কিছুদিন আগে তামিলনাড়ুর আরাভাকুরিচিতে আসন্ন উপনির্বাচনে কমলের নিজের দল মাক্কাল নিধি মাইয়মের হয়ে ভোট চাইতে গিয়ে তিনি বলেন, 'স্বাধীন ভারতের প্রথম সন্ত্রাসবাদী ছিলেন একজন হিন্দু। তার নাম নাথুরাম গডসে।' স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ হন সারা দেশের মানুষ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় বয়ে যায়। প্রশ্ন ওঠে, আরাভাকুরিচি মুসলমান প্রধান বলেই কি কমলের এই মন্তব্য? না কি এর পিছনে রয়েছে গোপন কোনও ষড়যন্ত্র?

অনেকেই হয়তো বলবেন, অতি ব্যবহারে ষড়যন্ত্রের তত্ত্বটি আজকাল বেজায় ক্লিশে হয়ে গেছে। কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি বিবেচনার মধ্যে রেখে যদি কমল হাসানের মন্তব্যটি বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে দক্ষিণী অভিনেতা আলটপকা কিছু বলেননি। অন্তত বিচক্ষণতা না হোক, দেশের মুলধারার রাজনৈতিক চালাকিটি তিনি ভালোই রপ্ত করেছেন। ভারতবর্ষ গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা করে। সুতরাং তাঁর হত্যাকারীকে এ দেশ কোনওদিনই ক্ষমা করবে না। এ তো সবাই জানে। কিন্তু এসব কথাবার্তায় রাজনৈতিক লাভ কোথায়? বস্তাপচা ডায়ালগ আউড়ালে চিড়ে ভেজে না। বিশেষ করে চিড়ে যদি মুসলমান হয়। হ্যাঁ, লাভ হতে পারে নাথুরাম গডসেকে যদি হিন্দু হিসেবে তুলে ধরা যায়! কথাটা মিথ্যেও নয়। নাথুরাম হিন্দু তো ছিলেনই, তার ওপর ছিলেন ব্রাহ্মণ। যে কারণে গান্ধীহত্যার পরেই গোটা মহারাষ্ট্র জুড়ে শুরু হয়েছিল ব্রাহ্মণ-হত্যা। তখন ক্ষমতায় কংগ্রেস। ব্রাহ্মণদের পাশে দাঁড়ালে পাছে ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তিতে কালি লাগে তাই কংগ্রেস হাত গুটিয়ে বসে ছিল। স্বাধীনতার পর সুদীর্ঘ শাসনকালে এইভাবে স্রেফ রাজনৈতিক ফয়দা লোটার জন্য কংগ্রেস যে কত হিন্দুকে খুন হতে দিয়েছে তার কোনও হিসেব নেই।

কমল হাসান কংগ্রেসের এই ছক

ফঃ ৬

ভালোই বোঝেন। তিনি জানেন সহস্রাধিক বছর ধরে একতরফা মার খেতে খেতে হিন্দুদের পরমতসহিষ্ণুতার মতো মহান আদর্শ এখন এক রসিকতায় পরিণত হয়েছে। নাথুরাম গডসের হিন্দু পরিচয় তুলে ধরলে হিন্দু সন্ত্রাসের অস্তিত্ব সম্পর্কিত বিতর্কটি আরেকবার উসকে দেওয়া যায়। যতই আদালত বলুক, হিন্দুত্ব নিছক ধর্ম নয়। এটি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের জীবনযাপনের পথনির্দেশ। কমল হাসান জানেন, এদেশে গুজবের স্থান আইনের অনেক ওপরে। বিশেষ করে সেই গুজব যদি কমল হাসানের মতো সুপারস্টার অভিনেতা এবং সিনেমার জনপ্রিয়তা- ভাঙানো রাজনীতিবিদের মুখ থেকে ছড়ায় তাহলে তো আর কথাই নেই। গল্পের গোরুর গাছে চড়তে বেশি সময় লাগে না। কমল হাসান এটাও জানেন, নাথুরামকে হিন্দু সন্ত্রাসবাদী বলার অছিলায় হিন্দু সন্ত্রাসের হাস্যকর ধারণাটি বাজারে ছাড়লে হিন্দুরা বড়োজোর দু-চারদিন একটু হৈ চৈ করবে। তারপর ভুলে যাবে। কিন্তু খুশি হবে মুসলমানরা। আরাভাকুরিচি মুসলমান-অধ্যুষিত জায়গা। সুতরাং মুসলমানদের বশে রাখতে হিন্দুদের যত পারো গালাগাল দাও। মুসলমানদের বোঝাও, সারা বিশ্ব তাদের সন্ত্রাসবাদী ভাবলেও, ইসলামকে জিহাদি ধর্ম হিসেবে মানলেও— এই ভারতবর্ষে তারা একা জঙ্গি নয়। হিন্দুরাও জঙ্গি। নাথুরাম গডসে হিন্দু সন্ত্রাসবাদের প্রতিনিধি। তার অপরাধও কিছু কম নয়। তিনি এ দেশে রাজনৈতিক অভিজাততন্ত্রের জনক গান্ধীজীকে হত্যা করেছিলেন। কমল হাসান এই অভিজাততন্ত্রেরই ফসল। সুতরাং ভারতবর্ষে অধুনা-বিকশিত চা-ওয়ালা মার্কা রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় তার রুচি থাকবে না, এটা স্বাভাবিক। এবং তিনি ও তার দোসররা পেডিগ্রিকে ভারতীয় রাজনীতিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হবেন। আমরা যারা বাঙ্গালি তারা দেখব, পশ্চিমবঙ্গে কচিকাঁচাদের পাঠ্যপুস্তকে ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকিরা 'সন্ত্রাসবাদী' শিরোপায় ভূষিত হয়েছেন।

এখন পশ্চিমবঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সশস্ত্র আন্দোলনকারীদের জঙ্গি বলা হচ্ছে। কারণ সশস্ত্র আন্দোলন তো বটেই, গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে অহিংস আন্দোলন হয়েছিল— সেটাও ছিল হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মুসলমানদের দলে টানার জন্য গান্ধীজী খিলাফতের মতো ভারতবর্ষ ও ভারতীয়ত্বের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। এই কর্মসূচি রূপায়ণে পদ্ধতিগত ত্রুটির কথা স্বীকার করে নিয়েও বলা চলে কোনও অসৎ উদ্দেশ্য গান্ধীজীর ছিল না। তিনি শুধু মুসলমানদের ভারতের জাতীয় আন্দোলনে মেলাতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় সমাজে সর্বোদয়ের প্রবক্তার পক্ষে এই চাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু লাভ কিছু হয়নি। গান্ধীজী মুসলমানদের বুঝতেই পারেননি। মুসলমানরা কংগ্রেসকে হিন্দুদের দল হিসেবে দেগে দিয়ে মুসলিম লিগের ছাতার তলায় ভিড়েছিল। তবে গান্ধীজীর এই অপরিণামদর্শিতায় উপকার হয়েছিল কংগ্রেসের। ধর্মনিরপেক্ষতা নামক পাঁচনের মশলা পাওয়া গিয়েছিল খিলাফতের ভাঁড়ারে। সত্তর বছর ধরে দেশের প্রতিটি মানুষ এই পাঁচন দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাচ্ছে। বস্তুত এই পাঁচনের ঘোরেই হিন্দুরা এতকাল ঘুমিয়ে ছিল। দেশভাগের পর কুড়ি লক্ষ হিন্দুকে হত্যা, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বিতাড়ন, পশ্চিমবঙ্গে মরিচঝাঁপি, ১৭ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা ইত্যাদি খবরের শিরোনাম হলেও হিন্দুদের মনে খুব একটা রেখাপাত করেনি। মুসলমানের হাতে কাটারি দেখে ভয়ে ঘরে ঢুকে পড়া হিন্দু ধর্মনিরপেক্ষতার চাদরে মুখ ঢেকে প্রাণ যেমন বাঁচিয়েছে, তেমনি বাঁচিয়ে রেখেছে কংগ্রেস নামক ক্ষমতালোলুপ প্রতিষ্ঠানটিকেও।

কমল হাসানও কংগ্রেসের এই পাঁচন মানুষকে খাওয়াতে চান। কিন্তু মুশকিল হলো আজকের ভারতের অবিসংবাদী নেতার নাম নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। আজকের ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি। আজকের ভারতের আত্মনির্মাণের কারিগর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। নাথুরাম গডসেকে হিন্দু সন্ত্রাসবাদী বলার সময় কমল হাসান সম্ভবত এই কথাগুলো ভুলে গিয়েছিলেন। তবে তাতে ক্ষতি কিছু হয়নি। হিন্দুরা যে পাঁচনের ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠছেন, সেকথা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছেন এক অত্যুৎসাহী ব্যক্তি। পায়ের জুতোটি খুলে ছুঁড়ে মেরেছেন কমল হাসানকে লক্ষ্য করে। না, তার কাজ মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু তার ক্ষোভ এবং উত্তেজনাবশত ভালোমন্দের জ্ঞান হারিয়ে ফেলা— দুটোই এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে নির্বিচার মুসলমান তোষণের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ কি সোশ্যাল মিডিয়ায় এইভাবেই ফুঁসে উঠছেন না? খবরের কাগজ যে গল্পই শোনাক, ধর্মনিরপেক্ষতার তত্ত্বটিকে প্রত্যাখ্যান করছে মানুষ। কারণ সবাই জেনে গেছে আমাদের দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে হিন্দুবিদ্বেষ। প্রতিটি ধর্মনিরপেক্ষ দলের রাজনৈতিক দর্শন মোটামুটি এক। হিন্দুদের ভাগ করো আর মুসলমানদের এক করো। বাম হোন বা কংগ্রেসি, মমতাপন্থী হোন বা মায়াবতীপন্থী— মোল্লাতন্ত্রের পিঠ চাপড়ানি না পেলে এদেশের রাজনৈতিক নেতারা নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে পারেন না। ইফতার পার্টিতে মমতা হিজাব পরেন, নমাজ পড়েন, রাহুল গান্ধীকে মাথায় ফেজটুপি পরে গদোগদো হয়ে উঠতে দেখা যায়। বাঙ্গলার মমতাপন্থী কবি সুবোধ সরকার গোরুর মাংসের প্লেট হাতে রাস্তায় সস্তা নাটক করেন। এসব সাধারণ মানুষ এতদিন শুধু দেখার জন্য দেখেছেন। গা গুলিয়ে উঠলেও প্রতিবাদ করেননি। কিন্তু এখন তাদের মুখ ফুটেছে। এখন তারা এইসব উলঙ্গ রাজাদের সামনে দাঁড়াতে পারেন। জিজ্ঞাসা করতে পারেন, রাজা তোর কাপড় কোথায়?

কমল হাসান কি হিন্দুদের জেগে ওঠার কথা জানেন? না জানলে জেনে নিন। ভুলভাল টনিক দিলে পাবলিকের বদহজম বাড়বে। এই পাবলিক কিন্তু কথা বলতে পারে। পেডিগ্রির ধার না ধেরে ক্ষোভও উগরে দেয়। ■

ভোটের তরজায় অপসংস্কৃতির আমদানি

অনিলচন্দ্র দেবশর্মা

রাজনীতি শব্দের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে— রাজ্য শাসনবিষয়ক নীতিশাস্ত্র। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চতুর্বিধ উপায়। এখানে রাজ্য বলতে দেশকে বোঝানো হয়েছে। রাজনীতি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ নীতি বা রাজার আদর্শনীতি। সেজন্য রাজাকে 'নরশ্রেষ্ঠ বলা হয়'। যে নীতি অনুসরণ করে রাজা রাজ্য তথা দেশের প্রজাদের মঙ্গলসাধন করেন, প্রজারা যাতে সুখ-শান্তিতে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখেন তাকে রাজনীতি বলে। এই শাসনব্যবস্থাকে 'রাজতন্ত্র' বলা হয়।

ভারতে বহু সাধক আছেন যারা 'তন্ত্র' সাধনা করেন। তাঁদেরকে 'তান্ত্রিক বলা হয়। ভারত সহ এক সময় সারাবিশ্বে রাজারাই দেশ শাসন করতেন। এক শ্রেণীর 'ক্ষমতাবান প্রজারা' রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করে রাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে 'গণতন্ত্র' নামক এক নতুন 'তন্ত্র'-র সাধনা করছেন। এইসব সাধকদের— 'গণতান্ত্রিক সাধক' বলা হয়। গণতন্ত্রে প্রজারাই রাজা নির্বাচন করেন। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর রাজা নির্বাচন উৎসব পালিত হয়। তান্ত্রিকদের মধ্যে 'কাপালিক তান্ত্রিক বলে এক শ্রেণীর তন্ত্রসাধক আছেন। যাদের 'নরবলি' ছাড়া সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় না।

গণতান্ত্রিক রাজা নির্বাচনেও রক্তপাত ছাড়া রাজা নির্বাচিত হন না। নির্বাচন এলেই হিংসার আগুন চারিদিক দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। ওই আগুনে অনেকের মৃত্যু ঘটে। ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। প্রজাদের নির্বাচনে অংশ নিতে বাধা দেওয়া হয়। অনেক প্রজার ভোট অন্য কেউ দিয়ে দেয়। এগুলো হচ্ছে 'গণতন্ত্রে' তন্ত্রসাধনার অঙ্গ। এ নাহলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা যায় না, ইদানীং রাজা নির্বাচনে কিছু নতুন ভাষার আমদানি করা হয়েছে, যা শুনে বোবাও প্রতিবাদ করেন। রাজা হওয়ার প্রতিযোগিতায় ক্ষমতাবান প্রজারা অংশ নেন। তাতেই পুরানো রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। নোংরা, অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দিতে শুরু করেন। যা নয় তাই, বলে যান। কখনও বলছেন তুই দেশের জন্য কী করেছিস? তুই একটা দাঙ্গাবাজ। তোর পরমায়ু ২০১৯-ই শেষ। তোর কোমরে দড়ি বেঁধে জেলে ঢোকানো উচিত। চ্যালারা আরও এককাঠি উপরে গিয়ে বলে থাকে 'নকুলদানা খাওয়ার কথা, পাঁচন দিয়ে তাড়াবেন, চড়াম, চড়াম শব্দ হবে। আর এক নেতাকে বলতে শুনেছি— দলীয় কর্মীদের বলছেন যা, ভোটটা করিয়ে দে?

কলকাতার মহানাগরিক একজন মহিলা অধ্যাপিকাকে বলেছেন, 'কে তুমি নন্দিনী আগে তো দেখিনি।' রকের ভাষায় কথা বলা ওইসব নেতা-নেত্রীরা নিজেদের প্রগতিশীল মনে করেন।

অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'তিন ভুবনের পারে' ছায়াছবিতে, রকবাজ ছেলেরা ওই গান করতে করতে একজন শিক্ষিকার পেছনে হাঁটছেন। এই সংস্কৃতি নকল করছেন মহানাগরিক। ওই মহানাগরিক পাকিস্তানি প্রতিনিধিদের গার্ডেনরীচ, খিদিরপুর এলাকা ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। দেখিয়ে বলেছিলেন 'মিনি পাকিস্তান'। এই হলো ওদের দেশভক্তি। এরাই দেশের সুনাগরিক?

বিরোধীরা প্রায়ই বলে থাকেন— গেরুয়াশিবির রাজনীতিতে ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে। অথচ কলকাতার টিপু সুলতান মসজিদের ইমাম বলেছিলেন— মোদীর দাড়ি, চুল কামিয়ে কেউ যদি মুখে কালি মেখে দেয় তাকে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। একজন ধর্মীয় নেতার এ ধরনের বক্তব্যকে কী বলা যায়?

আমার ৭৬ বৎসর জীবনে বহু নির্বাচন দেখেছি। অনেক নেতা-নেত্রীর ভাষণ শুনেছি। সে সময় কোনো নেতা-নেত্রীকে এত উলঙ্গ ভাবে কাউকে আক্রমণ করতে দেখিনি। নেতা-নেত্রীরা এখন সে ভাষায় একে অপরকে গালাগাল দিচ্ছে, শালীনতা বলে কিছু নেই। নেতা-নেত্রীদের ন্যায়, নীতি, আদর্শ বলে কিছু নেই। যেন তেন প্রকারে ক্ষমতা দখল করাই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কথায় আছে--- বড়োদের আচরণ দেখেই ছোটোরা শিক্ষা লাভ করে। বর্তমান রাজনৈতিক নেতারা যেভাবে রাজনীতিতে নোংরা অশ্লীল ভাষা, অপসংস্কৃতি আমদানি করেছে, এ সব দেখে বর্তমান প্রজন্মের যুবক-যুবতী কোন ধরনের শিক্ষা লাভ করবেন? অনেকেই হয়তো এই আদর্শ হীন রাজনীতিকেই আদর্শ বলে মনে করবে। নোংরা ভাষায়, হাত, পা, নেড়ে গলার শির ফুলিয়ে ঝগড়ার ভঙ্গিতে বক্তব্য রাখাই আদর্শ রাজনীতি? এখানে শালীনতা বলে কিছু নেই। অশালীন ভাষায় বাক্য বর্ষণই হচ্ছে আসল নেতার পরিচয়।

সব রাজনৈতিক দলের উচিত যারা ক্ষমতায় ছিল তারা বিগত পাঁচ বছর দেশের জন্য কী কী করেছেন তা তুলে ধরা। আগামী পরিকল্পনা কী তাদের তাও ভোটারদের জানানো। বর্তমানে নির্বাচন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে যা চলছে, তাকে কোনোমতেই সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক নির্বাচন বলা যায় না। গণতন্ত্রের কারবারীরা গণতন্ত্রের কবর খুঁড়ে রেখেছেন। শুধু মাটি চাপা দেওয়ার অপেক্ষায়, বিশেষ করে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে।

শাসকদলের নির্দেশে ডায়মন্ডহারবারের গ্রাম হিন্দুশূন্য করার পরিকল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা।। কাশ্মীরের পুনরাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের ডায়মন্ডহারবার লোকসভার নজাহারি, সাতগাছিয়া বিধানসভার কয়েকটি গ্রামে। এরমধ্যে বগাখালি গ্রামটি শাসকদলের মদতপুষ্ট জেহাদিরা প্রায় হিন্দুশূন্য করে ফেলেছে।



ঘটনার সূত্রপাত গত ১১ মে বগাখালি গ্রামের বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার সারানোকে কেন্দ্র করে। বেশ কিছুদিন যাবৎ গ্রামের বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে রয়েছে। গ্রামে বিদ্যুৎ নেই, চাষের জমি শুকিয়ে যাচ্ছে, ব্লক অফিস, রাজনৈতিক নেতা কাউকে কিছু বলে লাভ হচ্ছে না। কারণ বেশিরভাগ হিন্দু বিজেপির সমর্থক। সবার এক কথা আগে তৃণমূলে যোগ দাও, তারপর ট্রান্সফরমার সারানো হবে। অথচ পাশের গ্রাম নজাহারিতেও ট্রান্সফরমার খারাপ হয়েছিল। তারা মুসলমান ও তৃণমূলের সমর্থক হওয়ায় তাদের ট্রান্সফরমার সারিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে বগাখালি গ্রামের লোকজন বিদ্যুৎকর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ জানাতে থাকে। তখন বিদ্যুৎকর্মীদের একজন পাশের গ্রাম নজাহারিতে ফোন করলে তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামীর নেতৃত্বে একদল জেহাদি গুন্ডা ছুটে এসে বগাখালি গ্রামের হিন্দুদের ওপর চড়াও হয় এবং বহু দোকান ভাঙচুর ও লুঠপাট করে চলে যায়।

১২ তারিখে আবার একপ্রস্থ গণ্ডগোল হয়। গ্রামে পুলিশ পিকেট বসে। কিন্তু ১৩ তারিখ সকালে নজাহারি গ্রামের মসজিদের মাইক থেকে বগাখালি গ্রামের হিন্দুদের ওপর আক্রমণ নির্দেশ দেওয়া হলে কয়েক হাজার জেহাদি সকাল ন'টায় বোমা, পিস্তল, তলোয়ার নিয়ে বগাখালি গ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশ ভয়ে লুকিয়ে পড়ে। রাজকুমার মণ্ডল, অমল সরদার, সুভাষ মমজল, সৌরভ সরদার, নদীরাম সরদার ও জগদী মণ্ডলকে জেহাদিরা মারাত্মকভাবে জখম করে। ২০টি বাড়িতে আগুন লাগানো হয়। বরুণ সরদার, ভোলা সরদার, হারান মণ্ডল, নিত্যানন্দ মণ্ডল ও শঙ্কর মণ্ডলের বাড়ি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। বহু দোকান লুঠ করে আগুন লাগানো হয়। খাগড়ামড়ি গ্রামের উদয় মণ্ডলের জলের কারখানটি ভেঙে লুঠ করে জেহাদিরা।। বাড়ির মহিলাদের ওপর অত্যাচার চালানো হয়। অন্য গ্রামের লোক এবং কোনও মিডিয়াকে জেহাদিরা গ্রামে ঢুকতে দেয়নি। বিকেলে র‍্যাফ নামে।

১৮ তারিখ তৃণমূলের বিদায়ী সাংসদ তথা ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অভিষেক ব্যানার্জি এলাকায় আসেন। তিনি শুধু মুসলমান-অধ্যুষিত গ্রামগুলিতেই যান। বগাখালি গ্রামে আসেননি বা কোন্য হিন্দুর সঙ্গের কথাও বলেননি। বগাখালি গ্রামের মানুষের অভিযোগ ভোটের আগেই তিনি এলাকা বিরোধীশূন্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। ভয়ে দলে দলে হিন্দু গ্রাম ছেড়ে আত্মীয়ের বাড়ি চলে যাচ্ছেন। এলাকা প্রায় হিন্দুশূন্য হতে চলেছে। মাইকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে ভোটের পর কেন্দ্রীয় বাহিনী চলে গেলে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হবে এবং সেটা নাকি খুব ভয়ংকর হবে। সেই আতঙ্কে আশেপাশের গ্রামের হিন্দুরা বাড়ির মেয়েদের দূরের আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে রেখে আসছেন। পশ্চিবঙ্গের মিডিয়া এবিয়য়ে একেবারে নিশ্চুপ।

মাঝারি পাল্লার ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা ভারতীয় নৌবাহিনীর

আকাশে শত্রুপক্ষের হামলার মোকাবিলায় মাঝারি পাল্লার ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপযাগ্য ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা ভারতীয় নৌবাহিনী, প্রতিরক্ষা গবেষণা উন্নয়ন সংস্থা এবং ইজরায়েলের অ্যারোস্পেস ইন্ড্রাস্ট্রির বিজ্ঞানীরা সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন। এর ফলে ভারতীয় নৌবাহিনীর ক্ষমতা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করছেন সমর বিশেষজ্ঞরা। গত ১৬ মে কোচি ও চেন্নাই থেকে ভারতীয় নৌবাহিনীর দুটি জাহাজ ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে আকাশে নিক্ষেপ করা হয়। অন্য একটি জাহাজ থেকে ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রণ এবং লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার বিষয়টি পরিচালনা করা হয়। যুদ্ধ জাহাজে এই ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষার ফলে ভারতীয় নৌবাহিনী বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকটি নৌবাহিনীর পর্যায়ে উঠে এল। ভারতীয় নৌবাহিনীর এই দক্ষতা শত্রুপক্ষের সম্ভাব্য আক্রমণ মোকাবিলায় আরও কার্যকর হয়ে উঠবে বলে আশা করছেন প্রতিরক্ষা দপ্তর।

সহজ উপায়ে জল পরিশোধনে খড়্গপুর আইআইটি-র প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আইআইটি খড়্গপুরের নকশা উদ্ভাবন কেন্দ্রের গ্রামোন্নয়ন কেন্দ্র পানীয় জল প্রযুক্তির ওপর যে হেকাথনের আয়োজন করে তাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওয়াটার রিসোর্স টেকনোলজির স্নাতকোত্তর এবং গবেষণারত তিন ছাত্র দেবদাস চৌধুরী, সৌরভ কুমার বসাক ও প্রিয়ব্রত মণ্ডল বাড়িপিছু মাত্র দু'হাজার টাকায় মরচে পড়া পেরেক দিয়ে জল আর্সেনিক মুক্ত করার বিষয়ে জানিয়েছেন। তাঁদের পরীক্ষায় জল থেকে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড দুইই অপসারণ করা যাচ্ছে। এই হ্যাকাথনের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ ভারতে পানীয় জল সমস্যায় কম খরচে বিভিন্ন উদ্ভাবনী সমাধান। এই হ্যাকাথনে পূর্ব ভারতের প্রথম সারির ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের ১৩টি দল অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় আইআইটি খড়্গপুরের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ছাত্রী ঊষা কুমারী দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি অ্যালুমিনার মধ্যে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রয়োগ করে জল থেকে আর্সেনিক ও ফ্লোরাইড দূরীকরণের একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন। তৃতীয় পুরস্কারটি গেছে যৌথভাবে দুটি প্রতিষ্ঠানের কাছে। এনআইটি ওয়ারাঙ্গলের পড়ুয়ারা আর্সেনিক দূরীকরণের ক্ষেত্রে গাছের 'ফাইটোরেমেডিয়েশন' পদ্ধতি ব্যবহার করছেন। শিবপুর আইআইইএসটি-র ছাত্র-ছাত্রীরা আর্সেনিক দূরীকরণে 'ইলেক্টোকোয়াগুলেশন' পদ্ধতি প্রয়োগ করেন। আইআইটি খড়্গপুরের ডেপুটি ডিরেক্টর ড. শ্রীমান কুমার ভট্টাচার্য সকলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। হ্যাকাথনে সহজলভ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন, ধানের তুষ, কাঠের গুঁড়ো, লোহার পেরেক, নুড়ি এবং মাটির পাত্র।



জল পরিশোধন যন্ত্রের উদ্ভাবক তিন ছাত্র।

বিজয়ী দলগুলির উদ্বাবন নিয়ে আইআইটি খড়্গপুরে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে 'গ্রামীণ জলের মান এবং ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালরে অধ্যাপক কেট হেল বলেন, ভারতীয় গবেষক ছাত্র-ছাত্রীদের জল পরিশোধনে বিভিন্ন ধরনের চিন্তাভাবনা দেখে তিনি অবিভূত। তিনি আশা করেন, এতে গ্রামীণ জলের মানোন্নয়ন, পরিশোধন, নিকাশি জলের শোধন ইত্যাদি নিয়ে গবেষণার সুযোগ তৈরি হবে।

নির্বাচনে ভাষণ ও বিতর্কের মান অবনমনে ক্ষোভ উপরাষ্ট্রপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে রাজনেতিক ভাষণ ও বিতর্কের মান অবনমনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বেশিরভাগ রাজনীতিবিদ জনস্বার্থের বিভিন্ন বিষয়কে এড়িয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ চালিয়েছেন। সম্প্রতি কোস্টারিকা ইউনিভার্সিটিস অব পিস উপরাষ্ট্রপতিকে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি প্রদান করেছে। সেই উপলক্ষ্যে শ্রীনাইডুর বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীরা এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেন। অনুষ্টানে শ্রীনাইডু বলেন, রাজনীতিবিদদের মনে রাখা উচিত যে, তাঁরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী, শত্রু নন। সেজন্য ভাষা প্রযোগে সচেতন থাকা প্রযোজন। সমস্ত রাজনৈতিক দল, জনগণ ও সংবাদমাধ্যমের এবিষয়ে চিন্তাবাবনা করা উচিত। শ্রীনাইডু কম বয়সে আইনপ্রণেতা



হিসেবে তাঁর ভূমিকার কথা স্মরণ করে বলেন, সেই সময়ে সরকারের নানা নীতির তিনি কঠোর সমালোচনা করতেন। কিন্তু কাউকে ব্যক্তিগত আক্রনণ করেননি। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা এবং জনপ্রতিনিধিদেরও সম্মান প্রদর্শনের ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মান নেমে যাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি নির্বাচিত প্রতিনিধি, রাজনৈতিক দল, প্রতিষ্ঠান-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে মানোন্নয়নের আবেদন রাখেন। জনগণের কাছে তিনি আবদন রাখেন তাঁরা যেন লোভ, ব্যক্তিগত স্বার্থ ইত্যাদির মোহে না পড়ে না প্রার্থীর চরিত্র, ব্যবহার এবং গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করার বিষয়ে গুরুত্ব দেন। তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপহার সামগ্রী বিতরণ এবং নেতা-নেত্রীদের দলত্যাগের মতো ঘটনাগুলির তীব্র সমালোচনা করেন। সংবাদমাধ্যমের কাছে তাঁর পরামর্শ, খবরের প্রচারের সময় তারা যেন মতামতকে মিশিয়ে না ফেলে প্রতি পাঁচবছর অন্তর জনপ্রতিনিধিদের কাজের মূল্যায়ন করেন। তিনি বলেন, দেশের বিকাশের জন্য কেন্দ্রে ও রাজ্যে স্থায়ী সরকারের খুবই প্রয়োজন।

গান্ধী পরিবাবের সঙ্গে অ্যালবাট্রসের তুলনা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বিভিন্ন বুথ ফেরত সমীক্ষায় এনডিএ-র জয়ের খবর সম্প্রচারিত হওয়ার পর অরুণ জেটলি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন গান্ধী-নেহেরু পরিবার আর কোনোমতেই কংগ্রেস দলের সম্পদ নয়। উল্টে দীর্ঘ চঞ্চু বিশিষ্ট বিশাল আকার, অ্যালবাট্রস পাখি মানুষের গলা জড়িয়ে থাকলে তার যেমন চলৎশক্তি রহিত হয়ে যায়, এই পরিবারও কংগ্রেসকে আজ তেমনই করে তুলেছে দলের গলা আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরে। দলের কী সসেমিরে অবস্থা। এঁদের টেনে নিয়ে গেলে দেখবার জন্য দু' পাঁচটা লোক জড়ো হয় কিন্তু তারা আর দলকে ভোট দেয় না। এই বুথ ফেরত সমীক্ষার অভ্রান্ততা নিয়ে তর্ক চলতেই পারে। কিন্তু কঠিন সত্য হলো যখন অনেকগুলি সংস্থার সমীক্ষা একই ফলাফলের দিকে ইঙ্গিত করে তখন এটা ধরেই নেওয়া যায় আসল ফলাফলে বিশেষ হেরফের হবে না, বলেন জেটলি। তিনি আরও জানান এই ধরনের সমীক্ষা ভোটাদাতার সঙ্গে কথোপকথোনের ভিত্তিতে ঠিক হয়। এখানে ইভিএম-এর কোনো ভূমিকা থাকে না। তাই এতগুলি সমীক্ষার সঙ্গে ২৩ তারিখের ফলাফল যদি মিলে যায় তখন দীর্ঘদিন চালিয়ে আসা বিরোধীদের ইভিএম নিয়ে ঝুটা অভিযোগের যুক্তিগুলি মুখ থুবড়ে পড়বে। কিছু কিছু নিকম্মা বিরোধী নেতা এখনই ইভিএম নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু করে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে জেটলি ২০১৪ সালের ফলাফল ও তার সঙ্গে বুথ ফেরত সমীক্ষার অনুমান মিলিয়ে দেখার অনুরোধ করেন। ভারতের গণতন্ত্র যে কতখানি পরিণত হয়ে উঠেছে ও দেশের ভোট দাতারা জাতীয় বিষয়কে কতটা গুরুত্ব দিয়ে তাঁদের মতাধিকার প্রয়োগ করেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সেই ফলাফলে পাওয়া যাবে।

পরিবারবাদী দল, জাতিবাদী দল ও তাঁবাদী মতাদর্শের বামদলগুলি ২০১৪ সালেই চরম ধাক্কা খায়। এই ধারারই অবশ্যম্ভাবী পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে চলতি নির্বাচনেও। পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীদের জোটবদ্ধ হওয়া কোনো দিনই টিকতে পারে না। দেশের নির্বাচকমণ্ডলী তা ভালোভাবেই জানেন। তাই এই স্বার্থান্বেষীদের তাঁরা আদৌ বিশ্বাস করেন না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এ বিষয়ে বিভ্রান্ত থাকতে পারেন কিন্তু ভোটদাতারা নন। তাঁরা কখনই একটি ত্রিশঙ্কু লোকসভা নির্বাচিত করবেন না যেখানে কুৎসিত ও জন্মসূত্রেই অচল কোন জোট তাদের লম্ফঝম্ফ দেখিয়ে দেশবিরোধী কিছু করতে পারে।

মোদী সরকারের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক সংস্কারগুলি কাজ দেখাতে শুরু করেছে



নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত লোকসভায় এনডিএ দুই সরকার এনসিএলএটি (ন্যাশনাল কোম্পানি ল' অ্যাপেলেট ট্রাইব্যুনাল) গঠন করে ব্যাঙ্কের টাকা হজম করে দেওয়া কোম্পানির মালিকদের পালাবার পথ বন্ধ করেছিল। এই আইন বলে চলতি পরিচালনবর্গ যদি কোম্পানিকে সঠিকভাবে চালাতে ব্যর্থ হয়ে ব্যাঙ্কের দেনা না শোধ করেন সেক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রব্যবস্থা রয়েছে। একই সঙ্গে বড়ো বড়ো মহীরুহ সম সংস্থাগুলির সম্পদ যাতে নয়ছয় না হয় সেক্ষেত্রে নতুন দরপত্র আহ্বান করা হয় যাতে দক্ষ পেশাদাররা কোম্পানির হাল ধরে কোম্পানিটিকে কিনে নিতে পারেন।

এই সূত্রে সম্প্রতি বিশাল Esser Steel কোম্পানি অযোগ্য মালিকের হাতে পড়ে দেনায় ধুকতে থাকে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংস্থা Arcelor Mittal এই রুগ্ন কোম্পানির যাবতীয় সম্পদ কিনে নেওয়ার দর দিয়েছেন ৪২ হাজার কোটি টাকা। এই সমস্ত প্রক্রিয়াই চলে আই বি সি অর্থাৎ Insolvency & Bankruptcy Code-এর আওতায়। উল্লেখ্য কোম্পানির মালিক স্টিল প্রমোটার Ruia-গোষ্ঠী এই হস্তান্তরে বারবার বাধা সৃষ্টি করেও ব্যর্থ হয়েছেন বলে খবর। দেশের প্রবীণ আইনজীবী হরিশ সালভে Aircel Mittal (ক্রেতা কোম্পানি)-এর পক্ষে দাঁড়িয়ে বলেছেন পূর্বতন মালিক কম করে ৮ বার ছলছুঁতোয় কোম্পানিটিকে বাঁচিয়ে ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করে দেশের সম্পদ সংরক্ষণে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। সালভে জানান প্রাথমিকভাবে কোম্পানির যে সম্পদ মূল্য ধরা হয়েছিল অর্থাৎ ১৬ হাজার কোটি টাকা। চলতি অফারটি প্রায় তিন গুণ মূল্যের।

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করেছেন এই আইনের প্রয়োগ যতই বাড়বে দেশের অসাধু কোম্পানি মালিকরা ততই বিপদে পড়বেন।



উদ্যানফসল উন্নয়ন

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

উদ্ভিদ উন্নয়ন বলতে বুঝি এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে কোনো একটি উদ্ভিদ প্রজাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষতা বাড়ে। যেসব বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন ঘটাতে হবে তার অন্যতম হচ্ছে ফসলের উৎপাদন ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি এবং রোগ ও পোকার প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি। কোনও ফসলের যে সমস্ত রকমারি কৌলিক (genetic variety) বৈচিত্র্য রয়েছে তার ব্যাপকতার সুযোগ গ্রহণ করে তা থেকে সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতটি নির্বাচন করার মধ্যেই উদ্ভিদ উন্নয়নের মূল সুর লুকিয়ে আছে। কোনো একটি ফসলের কৌলিক সম্পদ (genetic resources) বলতে বুঝি তার প্রজনন উপাদান (breeding materials), জাত- বৈচিত্র্য (Plant Culturer), কৌলিক ব্যাঙ্কে রক্ষিত দেশীয় বংশকুল (Nstive breeds), ও অন্যান্য উপাদান; ফসলের বুনোবংশকুল (wild population) এবং সম্পর্কিত বন্য প্রজাতি (Related wild species)। উদ্ভিদ প্রজননবিদ (Breeders) এই সমস্ত উপাদান নানা প্রান্ত থেকে নানাভাবে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন। এই নানান উদ্ভিদ উপাদানের মধ্যে যে উপযোগী বৈশিষ্ট্য আছে যা তাঁর নিজের উপাদিত জাতে বা প্রচলিত জাতের মধ্যে অনুপস্থিত তার সংযুক্তির কার্যক্রম গ্রহণ করেন (Breeding Prograens)। এইভাবে একটি ফসলের নতুন জাত উদ্ভাবন করতে একজন প্রজননবিদের ১০ থেকে ১৫ বছর সময় লেগে যায়। ফসল উন্নয়নের সামগ্রিক আলোচনা যে বিশেষ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত তার নাম হলো Plant Breeding বা উদ্ভিদ প্রজনন।

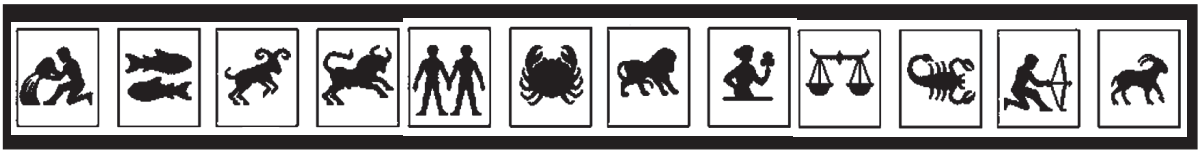
অধুনাতন উদ্ভিদ প্রজননবিদ্যার সর্বব্যাপী বিস্তারের মাত্র একশো' বছর আগেও ভারত-সহ সমগ্র বিশ্বে কৃষিজীবী মানুষই ছিলেন সমস্ত জাত-বৈচিত্র্য উদ্ভাবনের পথিকৃৎ; ফসল উন্নয়নে তাদের সমবেত অংশগ্রহণমূক অবদান ছিল (Participatory Plant Breeding)। বাঙ্গলার হাজার হাজার ধানের লৌকিক জাত; মালদা- মুর্শিদাবাদের শত শত আমের জাত নির্বাচন করে এসেছেন বাঙ্গলার আপামর প্রগতিশীল কৃষিজীবী মানুষ। মাঠের ফসলের বিপুল সম্ভার থেকে মনকাড়া উদ্ভিদের নির্বাচন এবং পর্যটনের মাধ্যমে অন্যত্র উৎপাদিত জাতবৈচিত্র্য নিজের এলাকায় সংযোজনের মাধ্যমেই উদ্ভিদ প্রজননের কার্যধারা চলত। এরও পূর্বে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ বুনো ফসলকে চাষের আওতায় এনেছে, ফলে ধারাবাহিক মনুষ্যক্রিয়ার মাধ্যমে এবং অতি অবশ্যই বিস্তীর্ণ ফসল জমির গাছ থেকে আদরণীয় গাছটি বেছে নেওয়ার মাধ্যমে কৃষির বিকাশ ঘটেছে— পরিণতিতে মানুষ নির্বাচিত ফসলজাত থেকে পেয়েছে অধিক উৎপাদন ও উৎকর্ষতা। পরবর্তীকালে নানান দেশের সরকার ও কৃষি গবেষণা কেন্দ্রগুলি সেই কাজগুলিই আরও বিজ্ঞানসম্মত ও নিখুঁত ভাবে করে চলেছে।

পরবর্তীকালে মেন্ডেলের বংশগতি সংক্রান্ত সূত্র আবিষ্কার ও আরও পরে বহুবিধ মৌলিক ও দীপ্তিমান আবিষ্কার উদ্ভিদ উন্নয়নের কাজেকে নতুন মাত্রা দিল। বংশগতির এই সূত্র ও তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানীরা তৈরি করলেন সংকর উদ্ভিদ সংকরায়ণ পদ্ধতিতে দুটি বা তার বেশি জাতিধারার আকাঙ্ক্ষিত চরিত্রগুলিকে এক নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে সমন্বয় ও সংযোগ করার মাধ্যমে সম্ভব হলো নতুন নতুন জাতবৈচিত্র্য। সংকরায়ণের এই পদ্ধতিই এবং বীজ উৎপাদনের এই প্রযুক্তি কৃষিবিকাশে যুগান্তকারী অধ্যায় সূচিত করেছে।

সংকর বা হাইব্রিড জাত নিয়ে বিশ্ববাসী আপ্লুত হলো যখন ১৯২০ সাল নাগাদ সংকর ভুট্টা বীজ বিশ্ববাজারে বাণিজ্যিকীকরণ করা হলো। এরপর একে একে বাজারে এল সংকর বেগুন (১৯২৪ সালে জাপানে), সংকর তরমুজ (১৯৩০), সংকর শশা (১৯৩৩), সংকর মূলা (১৯৩৫), সংকর টমেটো (১৯৪০) এবং সংকর বাঁধাকপি (১৯৪২)। বর্তমানে বিশ্বের উন্নত দেশের প্রায় অধিকাংশ সবজি ও ফল উৎপাদিত হচ্ছে সংকর জাতের বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে। ২৫ বছর পূর্ব থেকে ভারতবর্ষেও পরিলক্ষিত হচ্ছে সংকর বীজ প্রযুক্তির সুফল এবং এরই মধ্যে এর সর্বব্যাপিতা এমনই যে বর্তমানে ভারতবর্ষীয় টমেটো ও বাঁধাকপির ৮০ শতাংশ চাষ হচ্ছে হাইব্রীড বীজ ব্যবহার করে; ব্যবহার বহুলাংশে বেড়েছে লঙ্কা বেগুন, ফুলকপি, শশা, তরমুজ, ঢ্যাঁড়স, ঝিঙ্গে, উচ্ছে, লাউ, ক্যাপসিকাম ও খরমুজ ফসলেও। ভারতবর্ষে সংকরায়ণ প্রযুক্তির ব্যবহার সাধিত হয়েছে ফল উন্নয়নেও। আম্রপালি (দশেরী × নীলাম) এবং মল্লিকা (নীলাম × দশেরী)-র মতো সংকর আম সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে জনপ্রিয় হয়েছে; পরবর্তী সময়ে বাজারে এসেছে সংকর জাতের আম প্রবাশঙ্কর, মামুদ বাহার,। মঞ্জিরা, আর্কা আনমোল, রত্না, সিন্দু প্রভৃতি জাত।

উদ্যান ফসল চাষ ও উৎপাদনের নিরিখে ভারতবর্ষ সমগ্র বিশ্বে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে। মোটামুটি ভারতের স্থান দ্বিতীয়। কিন্তু তা হলেও বহুবিধ উদ্যান ফসলের উৎপাদনশীলতা বিশ্বের বহু উন্নতদেশ যেমন ইউরোপীয় দেশগুলি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় অনেকাংশে পিছিয়ে, পিছিয়ে এশিয়ার বেশ কিছু উন্নত দেশের উদ্যান ফসল চাষের চালচিত্র থেকেও আর এজন্যই বিজ্ঞানীদের সদাসতর্ক নজর ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো এবং একই মান উৎপাদিত ফসলের গুণমানও বাড়ানো। এ সংক্রান্ত সমুদয় আলোচনা উদ্যান ফসল উন্নয়নের (Horticultural Crop Inprotent) বিষয়বস্তু। ■

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল



২৭ মে (সোমবার) থেকে ২ জুন (রবিবার) ২০১৯। সপ্তাহের প্রারম্ভে মেষে শুক্র, বৃষে রবি, বুধ, মিথুনে রাহু, মঙ্গল, বৃশ্চিকে বক্রী বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, কেতু। পুনশ্চ ১ জুন, শনিবার বেলা ১১-৪৭ মিনিটে বুধের মিথুনে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র কুম্ভে শতভিষা নক্ষত্র থেকে মেষে কৃত্তিকা নক্ষত্রে।

মেষ ঃ নিজ নিরাপত্তা বিষয়ে সতর্ক থাকুন। গাম্ভীর্য, ব্যক্তিত্ব, প্রতিভার দীপ্তিতে শীর্ষস্থানে পৌঁছোবেন। অর্থনৈতিক সাফল্যে কূটনীতির কার্যকরী ভূমিকা থাকবে। হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তি। আকাশ পথে ভ্রমণ বর্জনীয়। বিদ্যার্থীর অনুকুল সপ্তাহ। বাচালতা পরিহারে জটিলাবস্থার অবসান, মানসিক প্রশান্তি।

বৃষ ঃ পারিপার্শ্বিক কারণে শারীরিক ও মানসিক উদ্বেগ ও ক্লেশ। তৃতীয় কোনো ব্যক্তির সহায়তায় প্রতিযোগিতা ও গবেষণায় অনায়াস সাফল্য। লৌহ, খনিজ, পরিবহণ ব্যবসায় নতুন উদ্যোগে অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ। বিভিন্ন যোগাযোগ, সহজ পথে কর্ম সমাধা, সমালোচকরা পদানত হবে। বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির উৎকর্ষতায় আত্মপ্রতিষ্ঠা।

মিথুন ঃ ব্যক্তিত্ব, মেধা, প্রতিভা, মননশীলতা বিকাশ। পদস্থ ব্যক্তির সাহায্য, সাংগঠনিক কুশলতায় সামাজিক শংসা প্রাপ্তি। উচ্চশিক্ষা ও বুদ্ধিমত্তায় সাহিত্যে নতুন চিন্তাভাবনার উদ্ভাবক। স্নেহ-ভালোবাসা, দয়ার্দ্রহৃদয়ে সমাজকল্যাণমূলক কর্মে ব্যাপৃত মন। জমি, বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত ও শরীরের ঊর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার।

কর্কট ঃ স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা ও সুললিত বাক্‌চাতুর্যে জনপ্রিয়তা ও প্রশংসাপ্রাপ্তি। ব্যবসায় বিনিয়োগ ও লিখিত চুক্তিতে সাবধানতা অবলম্বন জরুরি। সন্তানের চালচলনে আধুনিক মনস্কতা ও পড়াশুনায় অধ্যাবসায়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। প্যারালাইসিসজনিত হঠাৎ অসস্থতা।

সিংহ ঃ সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তার অবসান। চলমান সপ্তাহে আর্থিক বিষয় উৎসাহজনক। মাতার স্বাস্থ্যজনিত উদ্বেগ ও কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর অসহযোগিতা মনঃক্লেশের কারণ। শিল্পী, কলাকুশলী, সাহিত্যিকের সৃষ্টির আনন্দধারায় নব-নব সংযোজন, যশ, খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতি দয়াদ্রহৃদয়, সহানুভূতি ও মূল্যবোধের পরিসর বৃদ্ধি। ভ্রমণ ও রসনা তৃপ্তিতে ব্যাপৃত মন।

কন্যা ঃ আমদানি, রপ্তানি, শৌখিন দ্রব্য, বস্ত্র, ওষুধ, স্বর্ণ- অলংকার ব্যবসায় বিদেশি বন্ধুর সাহচর্যে ব্যাপ্তি ও সাফল্য। বিদ্যা, জ্ঞানার্জন ও গবেষণায় তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে সাফল্যের বারিধারা বর্ষণ। কর্মের যোগসূত্রে প্রবাস ও যুবক বন্ধু হিতকারী। নতুন আঙ্গিকে সার্বিক সাফল্যের নব-দিগন্তের সন্ধান।

তুলা ঃ চালাকি, কৌশলী মন ও উৎসাহের অভাব হেতু সন্তানের পড়াশুনায় আশানুরূপ ফল লাভে বাধা। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, তীর্থদর্শন, গুরুজন ও দেব-দ্বিজে ভক্তি তবে বিরোধিতা, সমালোচনা ছায়াসঙ্গী থাকবে। আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা কঠিন। সরলতারপূর্ণ মূল্যায়ন পাবেন।

বৃশ্চিক ঃ বাড়ি-গাড়ি ক্রয়ের বাস্তবায়ন। কর্ম-পরিকল্পনা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। প্রেম-প্রণয় ও পত্নীরূপের সার্থক প্রকাশ। দরকারি কাজ অর্ধ-সমাপ্ত থাকবে। সপ্তাহের প্রান্তভাবে প্রীতিকর মেলবন্ধন ও মানসিক প্রশান্তি।

ধনু ঃ পারিবারিক সুস্থিতি, স্বজন বাৎসল্য, সদ্ভাব, গৃহ ও বাহন যোগ, বাকপটুতায় সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সম্মান। দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি, পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণে কাব্য, শাস্ত্রজ্ঞ, প্রতিষ্ঠানের প্রধান, চিকিৎসকের বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশ ও বিজয়ীর সম্মান। গৃহে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহায়তা স্মরণীয়।

মকর ঃ আলটপকা মন্তব্য, বিতর্কিত পরিবেশ, চিন্তার দোদুল্যমানতা ও রমণীর সান্নিধ্য পরিহার করুন। কারিগরী কুশলতায় একাধিক পন্থায় আয়ের যোগ থাকলেও শ্লথ গতি। ভ্রাতা-ভগ্নীর শুভ সংবাদে পারিবারিক সদ্ভাব। প্রেমিক-প্রেমিকাদের আকাশ-কুসুম কল্পনায় রাহুর গ্রাস।

কুম্ভ ঃ গৃহসুখ বিনষ্ট ও অতৃপ্তভাব ছায়াসঙ্গী। দৃঢ় প্রত্যয়ে কর্ম পরিচালনায় অগ্রসর হলেও তা অসমাপ্ত থাকায় সম্ভাবনা। শিল্পী, সাহিত্যিক, কাব্য, কলা ও সংস্কৃতি জগতের ব্যক্তিদের দক্ষতা ও প্রতিভার ব্যাপ্তি, ও আভিজাত্য গৌরব। জীবনসঙ্গীর আগ্রহ ও পরিকল্পনায় স্ব-পরিবারে ভ্রমণ।

মীন ঃ জ্ঞান, পরাক্রম, তেজস্বিতা, ন্যায়পরায়ণতা, নীতিনিষ্ঠায় প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, সম্মান, পরিকল্পনায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা। অংশীদারদের সঙ্গে বোঝাপড়ার উন্নতি। নতুন উদ্যোগে বিনিয়োগ, বিশিষ্টজনের সহায়তায় অনায়াস কার্যসিদ্ধি। পিতার স্বাস্থ্য ও প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে শুভ নহে।

● ***জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।***

—শ্রী আচার্য্য